তঞ্চঙ্গ্যা জাতি

রতিকান্ত তঞ্চঙ্গ্যা

তঞ্চঙ্গ্যা জাতির ইতিহাস, ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি বিষয়ক আরও অধিক বই পেতে আমাদের মেইল করুন ঃ **chandrasen2014@gmail.com** এই ঠিকানায়।

গ্রন্থনা	Δ	**রতিকান্ত তঞ্চঙ্গ্যা** বালাঘাটা, বান্দরবান।
প্রথম প্রকাশ	Δ	এপ্রিল ২০০০ সাল
স্বত্ব	Δ	গ্রন্থকার কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
প্রকাশক	Δ	রতিকান্ত তঞ্চঙ্গ্যা
প্রচ্ছদ	Δ	গাজী কম্পিউটার
মুদ্রণে	Δ	**গাজী কম্পিউটার** ১৫৮, এভেনিউ ভবন (জেনারেল হাসপাতালের সামনে) আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। ফোন : ৬৩৭৪৯৭

সূচীপত্র

	মুখবন্ধ	৫
১।	সাপ্রে বা দৈনাক টং-চং-য়্যা বিবরণ	৭
২।	তঞ্চঙ্গ্যাদের সমতীত সংস্কৃতি	১৬
৩।	তঞ্চঙ্গ্যাদের সমতীতি জীবন	২০
৪।	সমতীত নিদর্শন	২৫
৫।	অনন্য দৃষ্টিতে তঞ্চঙ্গ্যা জাতি	২৯
৬।	সাংবিধানিক স্বীকৃতির দাবী	৩২
৭।	স্বারকলিপি প্রদান	৩৪
৮।	কৃতিত্ব ও অবদান	৪১-৫৫
	ঃ পালকধন তঞ্চঙ্গ্যা	
	ঃ শ্রীমৎ আচার মহাস্থবির	
	ঃ ফুলনাথ তঞ্চঙ্গ্যা	
	ঃ রাজকবি পমলাধন তঞ্চঙ্গ্যা	
	ঃ গোবীনাথ তঞ্চঙ্গ্যা	
	ঃ গীংখুলী শ্রেষ্ঠ রাজগিংখুলী জয়চন্দ্র তঞ্চঙ্গ্যা (কানা গিংখুলী)	
	ঃ কবিরত্ন কার্ত্তিক চন্দ্র তঞ্চঙ্গ্যা	
	ঃ ভিক্ষু শ্রীমৎ ক্ষেমাংকর মহাস্থবির	
	ঃ শ্রী যোগেশ চন্দ্র তঞ্চঙ্গ্যা	
	ঃ শ্রী ঈশ্বর চন্দ্র তঞ্চঙ্গ্যা	
	ঃ শ্রী বীর কুমার তঞ্চঙ্গ্যা	
	ঃ শ্রী কুঞ্জ তঞ্চঙ্গ্যা	
৯।	কে কোন বিষয়ে সর্ব প্রথম	৫৬
১০।	তঞ্চঙ্গ্যাদের মধ্যে উচ্চ শিক্ষা (ডিগ্রী) লাভ	৬০
১১।	তঞ্চঙ্গ্যাদের ভাষার নিজস্ব ও অনুকরণ শব্দ	৬২
১২।	তঞ্চঙ্গ্যাদের সামাজিক আইন	৬৬
১৩।	দেবান বা গাবুজ্যা দেবান	৬৯
১৪।	তঞ্চঙ্গ্যা ভাষায় প্রবাদ ও প্রবচন	৭০
১৫।	বানা (ধাঁধাঁ)	৮২
১৬।	বাদ্য যন্ত্র ও রাগ	৮৭-৯১
	ঃ খেংখং	
	ঃ ধুরুক	
	ঃ শিঙাল	
	ঃ চুমা	
	ঃ বেলা	
১৭।	তঞ্চঙ্গ্যাদের গছা গুইত্তি (গোত্র গোষ্ঠী)	৯২
১৮।	বাইন্	৯৩
১৯।	পসন্ (কিসসা বা রূপকথা)	৯৫
২০।	জুমিয়া ধান	৯৬

২১। জুমে উৎপাদিত কৃষি জাত ৯৭-১০১
ঃ ভাত কাইত্
ঃ ধাগাপং
ঃ মোগলী জেরেনা
ঃ ধান জেরেনা
ঃ কোইন্
ঃ ঘুচ্যা (তিল)
ঃ মুক্যা বা ভুট্টা
ঃ পাহাড়ী আলু
ঃ কচু
ঃ কলা
ঃ জংলীকলা
ঃ উল/বেঙের ছাতা/মাশরুম
২২। ফুল ১০২
২৩। তঞ্চঙ্গ্যাদের শুভ অশুভ বা আচরণ ১০৩
২৪। দুর্যোগ ১০৬
২৫। পশুপাখি কীট পতঙ্গের বন্যা ১০৭
২৬। ল্লাংগেই ডর ১০৮
২৭। মিজিলিক ডর ১০৯
২৮। খেতাবী প্রভাবশালীগণের দাপট ১১১
২৯। প্রজাদের উপর আইন জারী ১১২
৩০। রাউলী পুরোহিত ও ধর্ম ১১৩
৩১। খ্রীষ্টান ধর্মে অবগাহন ১১৬
৩২। পার্বত্য চট্টগ্রামের ভৌগলিক বিবরণ ১১৬
৩৩। পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলার বিভক্তি ১১৯
৩৪। পার্বত্য সংকট পর্যালোচনা ১১৯
৩৫। তঞ্চঙ্গ্যাদের বাচ্যানী (জাগরনী) গীত ১২৩

মুখবন্ধ

পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতিয়দের মধ্যে চাকমা, মারমা (মগ), ত্রিপুরা, তঞ্চঙ্গ্যা, ম্রো, চাক, রিয়াং, খুমি, পাংখুয়া ও বনযোগী (বম) প্রভৃতি উল্লেখ যোগ্য। নৃতাত্ত্বিক দিক থেকে এই সকল উপজাতি মঙ্গোলিয় বর্ণের। তাদের প্রত্যেকের রয়েছে আপন আপন ভাষা ও সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য। চাকমা ও তঞ্চঙ্গ্যাদের ভাষা অনেকটা বাংলার সমগোত্রীয় এবং ইন্দো-আর্য ভাষা গোষ্ঠী ভুক্ত বলে অভিহিত। মগ বা মারমাদের ভাষা বর্মী ভাষার অন্তর্ভূক্ত। ত্রিপুরাদের ভাষা অনেকটা তিব্বতো বর্মন এবং পাংখুয়া বম লুসেই প্রভৃতি মিজো জাতি ভুক্ত লোকেরা লাই-চীন ভাষাভাষী। ভাষা বিভেদ ছাড়া বিভিন্ন ধর্মমতের প্রভাব উপজাতীয় জনগণের মধ্যে লক্ষণীয়। চাকমা মারমা তঞ্চঙ্গ্যারা বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী। চাক ও ম্রো জাতিরা মগ বা মারমাদের সান্নিধ্যের পাশাপাশি অধিকাংশ বৌদ্ধধর্মাবলম্বী। ত্রিপুরারা হিন্দু ধর্মে বিশ্বাসী এবং পাংখুয়া বম লুসেইরা খৃষ্টান ধর্মের অনুসারী। আধুনিক ধর্মমত গ্রহণ করা সত্বেও কোন উপজাতিই প্রকৃতি পূজার প্রভাব থেকে মুক্ত নয়। ফল-ফুল ও নানা উপকরণ দিয়ে নদী বৃক্ষ প্রভৃতির পূজা করার রেওয়াজ এবং পশু পাখী বলি প্রথা আজো সব উপজাতির সামাজিক ক্রিয়া কলাপের মধ্যে বিধৃত হয়ে আছে। প্রধান উপজীবিকা জুম চাষের সংগেই অধিকাংশ পূজা আচার সংশ্লিষ্ট।

পৃথিবীর যে কোন দেশের, যে কোন জাতির কোন ইতিহাস গ্রন্থ খুললেই দেখতে পাই এর পাতাগুলা সে সব দেশের বা জাতির রাজা বা শাসকদের কাহিনীতেই ভরপুর। আসল জনগণের সুখ-দুঃখ, কৃষ্টি-সংস্কৃতি, উৎপত্তি এবং উত্থান-পতন কিংবা ভাগ্য বিপর্যয় ইত্যাদির কোন ছায়া সে ইতিহাস গ্রন্থে পড়েনি। কেবল দীর্ঘ নিবন্ধে নরপতি কিংবা সে জাতির জন্য গৌরবোজ্জ্বল কাহিনী দিয়ে আলোচ্য শতাব্দীর বিবরণী লিপিবদ্ধ হয়ে থাকে। কিন্তু এই নায়কদের বা বংশধরদের কেন্দ্র করে জনতার যে প্রবাহ আবর্তিত হতে হতে সদ্য উদ্গাত পার্বত্য স্রোতস্বতীর ন্যায় দু' পাশের তীর ভূমিকে আঘাত হানতে হানতে আপন আবেগে, কখনও মন্থর কখনও উদ্দাম গতিতে অপরিচিত যাত্রাপথে এগিয়ে চলছে, বিন্দু বিন্দু জল কণায় গঠিত সেই বিশাল বারিদেহের কোন স্বতন্ত্র পরিচয়- তার আশা আকাঙ্খা, ব্যথা-বেদনা, সাফল্য-ব্যর্থতা, স্বপ্ন ও বাস্তবতার কোন আলেখ্য নিবন্ধে তুলে ধরা প্রয়োজনে আসেনি।

আজ রীতি বদলেছে, ঐতিহাসিকের দৃষ্টি ভঙ্গি বদলেছে, মানুষের রুচি বদলেছে। তাই জনগণের আপন কাহিনী সমৃদ্ধ ইতিহাস রচনার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। শিলা পাত্রে, তাম্র পাত্রে, স্মৃতি সৌধে, প্রশস্তি লিপিতে স্বীয় কৃতিত্ব কাহিনী বিধৃত বিবিধ কাব্য সম্ভারে রাজন্যবৃন্দ তাঁদের গৌরব গাথা প্রচারিত করেছেন, জনগণ তা পারেননি।

তা সত্বেও জনগণ তাঁদের শ্রম দিয়ে, রক্ত দিয়ে, বুদ্ধি দিয়ে, প্রতিভা দিয়ে রাজন্যবৃন্দের যে কীর্তি গাথা রচনা করে আসছে পরোক্ষে তা নিজেরই অমর কীর্তি গাথা হয়ে বেঁচে আছে।

জনগণের যে বলিষ্ঠ বাহুর উপর, উদার হৃদয় ভরা প্রশান্ত বক্ষ পটের উপর সে জাতির রাজন্যবৃন্দের মানিক্য খচিত সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত, জাতির জন্য, দেশের জন্য নিবেদিত সেই বলিষ্ট বাহু এবং উদার হৃদয়ের পরিচয় কাহিনীতে প্রতিফলিত হয়না- ইতিহাসের পথ-পরিক্রমায় দেশ থেকে দেশান্তরে, স্থান থেকে এই সুদীর্ঘ সঞ্চরণ পথে পাথেয় সঞ্চয়ের নিমিত্ত আরাকানের দৈংনাক তঞ্চঙ্গ্যাদের দীর্ঘ প্রবাস জীবন, মহাকালের সময় গণনার হিসাবে এই জাতির জন্য একটি অভিশপ্ত মুহূর্ত। আরাকানের দীর্ঘ যাত্রা বিরতি শেষে এ অঞ্চলে আগমনের প্রেক্ষিতে প্রতিবেশী বৃহৎ জাতি সত্বা সমূহের সংগে ঐক্যতার নীড়, রচনার প্রার্থনা তুচ্ছতায় পরিণত হয়। ফলে নিয়ত সংঘাত ও সমন্বয়ের ফলে ভাষায়, বিশ্বাসে, আচারে, সামগ্রিক কৃষ্টির বিবর্তনে, চিন্তায়, মননে, মানসিকতায় ও মূল্যবোধে যে বিপুল পশ্চাৎপদ হতে হয়েছে তার সমীক্ষা গ্রহণের বিষয় ইদানিং এ পর্যায়ে যোগ্যতর গবেষকদের উপর আশা ছেড়ে দিয়ে তাদের জন্য পুস্তকটি রচনা করলাম যারা দৈংনাক তঞ্চঙ্গ্যা নামে অবহেলিত জাতি।

আমার স্বল্প সীমাবদ্ধ জ্ঞানের পরিসরে পুস্তকটি সাহস করে লিখতে গিয়ে বার বার বিপাকে পড়েছি। বিভিন্ন পুঁথি সংগ্রহ করে, বিভিন্ন প্রবীন গুণী জনের সাথে সাক্ষাৎ করে এবং বিভিন্ন স্থানে গিয়ে তঞ্চঙ্গ্যা জাতির তথ্য সম্পর্কে যেটুকু অভিজ্ঞান লাভ করেছি সে আহরিত তথ্যাদি দ্বারা তঞ্চঙ্গ্যা জাতির ইতিহাস প্রকাশ করলাম। কেননা একটি জাতির অস্তিত্ব রক্ষা, কৃষ্টি ও সংস্কৃতিকে জিয়ানো এবং দেশে বিদেশেও পরিচিতি লাভ করে দেয় একমাত্র ইতিহাস। সুতরাং ইতিহাস বিহীন যেমন একটি জাতি হতে পারেনা তেমনি সে জাতির সাংগঠনিক বৈশিষ্ট্যতা থাকার কথা নয়।

তঞ্চঙ্গ্যা জাতি লিখার ব্যাপারে আমার পরমারাধ্যগণের মধ্যে কবি কার্তিক চন্দ্র তঞ্চঙ্গ্যা, রাজগুরু অগ্রবংশ মহাস্থবির ও সুসাহিত্যিক বীরকুমার তঞ্চঙ্গ্যা আমাকে পূর্ণ সম্মতি পূর্বক উৎসাহ দিয়ে কৃতজ্ঞ ভাজন হয়েছেন। স্নেহের রত্না তঞ্চঙ্গ্যা, ভানু তঞ্চঙ্গ্যা ও রনি তঞ্চঙ্গ্যা এই পুস্তক ছাপার কাজে সহযোগিতা করেছে বলে তাদেরকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

গ্রন্থকার

সাপ্রে বা দৈনাক্ টং-চং-য়্যা বিবরণ

বাংলাদেশের পূর্ব সীমান্তে উত্তর-দক্ষিণ প্রলম্বিত ৫০৯৩ বর্গ মাইল আয়তন বিশিষ্ট এক বিস্তীর্ণ পার্বত্যাঞ্চলকে "পার্বত্য চট্টগ্রাম" বলা হয়। এই পার্বত্য চট্টগ্রাম ছিলো গভীর অরণ্য, হিংস্র প্রাণীকুল এবং দুর্গম পাহাড়াঞ্চল। এখানে পাহাড়ীদের দৈনন্দিন জীবন তাদের আগমন নির্গমন এবং অবস্থান অষ্টাদশ শতাব্দীর পূর্ব পর্যন্ত এ সম্পর্কে ইংরেজরা কেন আমাদের নিকটতম প্রতিবেশী বাঙ্গালীরাও কিছুই জানতো না। এমনকি বর্তমানেও এ অঞ্চলের ইতিহাস সবার কাছে অনুদ্ঘাটিত রয়ে গেছে। অতীতে উত্তর পূর্ব ভারতের সমগ্র অঞ্চলটি 'কিরাট ভূমি' নামে পরিচিত। পরবর্তীকালে আরাকান সীমানা পর্যন্ত 'কুকিল্যাণ্ড' হিসাবে পরিচিত ছিলো। এরপর ইংরেজ শাসনামলে চট্টগ্রামের এই পার্বত্য জেলাকে 'কার্পাস মহল' বলা হতো।

ভারতের উপর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বহু রাজ্য ছিলো। ওসব রাজ্যে পশ্চিমাঞ্চলের বিদেশীদের আগমন শুরু হয় ৭০০ খ্রীষ্টাব্দের দিকে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজাগণের রাজ্য সমূহের কোন সার্বভৌম শাসন ক্ষমতার অস্তিত্ব না থাকায় তাদের মধ্যে প্রতিহিংসা ও শত্রুতা বিরাজিত ছিলো। এই অনৈক্য আত্মকলহ এবং তাদের মধ্যে বংশ গোত্র, উঁচু নিচু বর্ণের ভেদাভেদ থাকার কারণে ভারতের উপর বিদেশীর বিজয়কে সহজতর করে তোলে। ফলে বহু রাজা বশ্যতা স্বীকার করেছিলেন আর ভিন্ন ধর্ম গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছিলেন। ওসব কারণে উত্তর পূর্ব ভারতের বসবাসরত মঙ্গোলীয় জনগোষ্ঠী দক্ষিণ পূর্ব দিকে ক্রমে ক্রমে অগ্রসর হতে শুরু করে।

এভাবে ভারতের আসাম ও ত্রিপুরা রাজ্য থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আসা এক একটি মঙ্গোলীয় জন গোষ্ঠী দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হতে শুরু করেন। তাদের মধ্যে ঐক্যবদ্ধ শক্তি গড়ে তোলে স্বাধীন জীবন যাপনের উদ্দেশ্যে সাদেংগ্রী নামের জনৈক ব্যক্তিকে রাজা মনোনীত করেন। রাজা সাদেংগ্রী ধার্মিক ও তাঁর অলৌকিক শক্তি ছিলো বলে গীংখুলীদের গীতের ভাষায় শোনা যায়। রাজা সৈন্য সামন্ত সংগ্রহ করে কালাবাঘা (বর্তমানে কুমিল্লা জেলা) রাজ্যের জালি পাগজ্যা* নামক স্থানে রাজধানী স্থাপন করেছিলেন বলে জানা যায়।

** জালি পাগজ্যা একটি বট জাতীয় বৃক্ষের নাম। এই বৃক্ষের পাকা বীজ পাখিরা খেয়ে অন্য একটি বড় গাছের উপর পায়খানা করে এবং সুবিধা মতো হলে সেখানে চারা রূপে জন্ম হয়। এই চারার শিঁকড় ক্রমে বৃদ্ধি পেয়ে জালের মতো সমস্ত গাছকে পেচিয়ে নিজে বৃদ্ধি পায় এবং বিশাল জালি পাগজ্যা রূপে শোভা বর্দ্ধন করে।*

সাদেংগ্রীর মৃত্যুর বহু বছর পর এই বংশের বিচগ্রী নামে উত্তরসূরী রাজা চেৎ-তো-গৌং (চট্টগ্রাম) শাসন করেছিলেন বলে 'চট্টগ্রামের ইতিহাস (প্রাচীন আমল) - মাহবুব রহমান এর পুস্তকে উল্লেখ রয়েছে। অনেকের মতে সাদেংগ্রীর জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম বিচগ্রী*। উক্ত সময়ে চট্টগ্রামের দক্ষিণাঞ্চল সহ রোয়াং (আরাকান) অবধি শাসন করতেন অক্কারাজা। পার্শ্ববর্তী দেশের রাজাগণের কাছে অজানা ছিলোনা তাঁর সৈন্য শক্তি ও পরাক্রমের কথা। এদিকে বিচগ্রী সৈন্য সংগ্রহ করে কোন এক শুভদিনে তিনি বেড়িয়ে পড়লেন অক্কারাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধাভিযানে সেনাপতি হিসেবে রাধামন ও জয়রাম দুই বিচক্ষণ যোদ্ধা। যুদ্ধে উভয় পক্ষের বহুলোক হতাহতের পর অবশেষে অক্কারাজা পরাজিত হয়ে বার্মায় পলায়ন করেন।

যুদ্ধে বহু বৎসর অবতীর্ণ হবার পর বিচগ্রী তার পিতা-মাতা, ভ্রাতা-ভগ্নি ও প্রতিবেশীর কথা মনে পড়ে প্রাণ কেঁদে ওঠে। তাই তিনি বিজয়ের আনন্দ উল্লাসে একদিন স্বদেশের দিকে রওনা দিলেন। স্বদেশের মাটিতে প্রত্যাবর্তনের আগে পথে শুনতে পেলেন তার বৃদ্ধ পিতার মৃত্যু হয়েছে, ছোট ভাই উদগ্রী স্বঘোষিত রাজা হয়ে তাঁকে স্বদেশে ফেরা পথে বাধা দেয়ার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছেন। এই সংবাদ পেয়ে বিচগ্রী খুবই মর্মাহত হন এবং অনুজের দুরভিসন্ধি ও বিশ্বাস ঘাতকতায় তিনি স্বদেশে স্বজাতির মুখ দর্শন করতে না পেরে পুনঃ তাঁর অধিকৃত রোয়াং রাজ্যে অর্থাৎ আরাকানে ফিরে যান। ১১০০ খ্রীষ্টাব্দে সেখানে স্থায়ী বসবাস, রাজ্য শাসন ও বংশ রক্ষার জন্য সৈন্যদের মধ্যে অনেকেই ভিন্ন জাতীয় রমনী বিবাহ করেন। আবার অনেকেই স্বদেশে গিয়ে স্বজাতীয় রমনী বিবাহ করেন। এভাবে রোয়াং রাজ্যে এ জাতির বসতি স্থাপন গড়ে ওঠে।

রাজা বিচগ্রী অপুত্রক ছিলেন। সম্ভবতঃ সম্রাট অশোকের মতো কলিঙ্গ বিজয়ের যে রক্তপাত হয়েছিলো তেমনি বিচগ্রীর শেষ জীবনে ভিক্ষুত্ব গ্রহণ করেন। রক্তপাত দেখে এবং তার অনুসারীগণ, সবাই বৌদ্ধ ধর্মে পুরোপুরি দীক্ষিত হন। বিচগ্রীর মৃত্যুর পর বহু বছর পর্যন্ত আরাকানের কিছু অংশ তাদের অধীনে ছিলো। উত্থান পতনের মধ্যে পরবর্তীতে চাগ্রে নামক স্থানে রাজধানী স্থাপন করেছিলেন। যাই হোক 'চাপ্রে' এই পরিব্যাপ্ত শব্দটি শত শত বছরের স্মৃতি এবং আরাকানী ইতিহাস গ্রন্থেও উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। সা-প্রে অর্থ চাংমা রাজ্য। তবে চাপ্রে বা সাপ্রে বলতে শুধুমাত্র তঞ্চঙ্গ্যা জাতিকে বুঝায়। তঞ্চঙ্গ্যাদের ৭টি গছা/গোত্রের মধ্যে দৈন্যাগছা মংলাগছা ও ম্মেলংগছার লোকদেরকে এখনও সবাই চাপ্রে নামে অভিহিত করে আসছে এবং নিজেরাও চাপ্রে কুল্যা বলে দাবী করে আসছে।

** গবেষকদের মতে বিচগ্রী, উদগ্রী ও সমগ্রী নামে তিন ভাই। চাকমাদের ভাষায় বিজয়গিরি, উদয়গিরিও সমরগিরি। আবার ত্রিপুরাদের রাজমালা ইতিহাসের মতে দেখা যায়, বিজয় মাণিক্য, উদয় মাণিক্য ও অমর মাণিক্য নামের ত্রিপুরা রাজা ছিলেন। ত্রিপুরা জাতির সেনাপতির নাম, কালানজির, রণগণ ও নারায়নের সংগে আমাদের সেনাপতি কালাবাগা, রাধামণ ও জয়রামের অদ্ভুত মিল দেখা যায়।*

চাকমা ইতিহাস মতে ১৩৩৩-১৩৩৪ খ্রীষ্টাব্দে আরাকানে বার্মা শাসকের সাথে চাপ্রে জাতির রাজা অরুণ যুগের ভীষণ যুদ্ধ হয়। উক্ত সনে ১৩ই মাঘ ১০,০০০ হাজার সৈন্য এংখ্যং ও ইয়াংখ্যং নামক এলাকায় বসবাস করেন এবং আরাকান রাজ তাদেরকে **দৈনাক বা দৈংনাক** অর্থাৎ অস্ত্রধারী যোদ্ধা নামে আখ্যায়িত করেন।

অক্সারাজার* সাথে চাপ্রেদের একাধিকবার সংঘর্ষ হয়েছিলো বলে ধারনা করা হয়। বার্মারাজ মেঙ্গদির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য চাপ্রেরাজ যে ফন্দি করেছিলেন তা লোক প্রবাদ নিম্নরূপ ঃ-

চাপ্রে রাজের তুলনায় মেঙ্গদি রাজের শক্তি বহু বেশী। মনে মনে সিদ্ধান্ত নিলেন বন্ধুত্ব ভাব দেখানো ছাড়া কোন উপায় নেই। তাই বন্ধুত্ব ভাব দেখিয়ে অতর্কিত আক্রমণের উদ্দেশ্যে চাপ্রে রাজ একটি চুনমাখা শ্বেত হস্তী মেঙ্গদি রাজকে উপহার পাঠালেন। এতে মেঙ্গদিরাজ খুবই সন্তুষ্ট হন। কিছুদিন পর হস্তীর শরীর প্রলেপ দেয়া চুনের সাদা আবরণ ঝরে যেতে শুরু করলো তখন মেঙ্গদিরাজ বুঝতে পারলেন এটা আসল নয়, নকল শ্বেতহস্তী। তিনি আর দেরী না করে চাপ্রেগণের উপর নির্যাতন শুরু করেন।

কথিত আছে- উক্ত সময়ে মেঙ্গদির লোকেরা খাজানা উশুল করার নামে চাপ্রেদের গ্রামে গিয়ে পুরুষদেরকে পিছ মোড়া বেঁধে গৃহের আঙ্গিনায় ফেলে সারারাত নির্যাতন করা হতো। আর স্ত্রীলোকদের দিয়ে মদ তৈরী করিয়ে সেই মদ পান করতঃ তাদেরকে যথেচ্ছা পাশবিক অত্যাচার চালাতো। ১৪১৮ খ্রীষ্টাব্দের মাঝামাঝি সময়ে গভীর অরণ্য পথে চাপ্রের অধিকাংশ লোক চট্টগ্রামের আলিকদম নামক স্থানে পালিয়ে আসেন। উক্ত সময়ে চট্টগ্রামের শাসনকর্তা জামাল উদ্দীন এর অনুমতি ক্রমে ১২ খানি গ্রামের সমন্বয়ে একটি ক্ষুদ্র রাজ্য গঠন করেন। উক্ত ১২ খানি গ্রামকে বলা হয়েছিলো **বারতালুক**। এই বারটি গ্রামের ১২টি তালুক বা দলের নাম তাদের বৈশিষ্ট্য ও আচরণের উপর রাখা হয়। যথাঃ- **১। দৈন্যাগছা, ২। মোগছা, ৩। কারবুয়া গছা, ৪। মংলাগছা, ৫। ম্মেলং গছা, ৬। ল্লাং গছা, ৭। অঙ্গগছা** এবং অবশিষ্ট পাঁচটি তালুক বা গছা উল্লেখিত গছার সাথে অন্তর্ভূক্ত হয়েছিলো বা পরবর্তীতে চট্টগ্রামের পার্বত্য অঞ্চলে চাকমা জাতির অন্তর্ভূক্ত হন কিংবা পুনরায় আরাকানে চলে যান বলে মনে হয়।

মেঙ্গদিরাজ চাপ্রে রাজার পরমা সুন্দরী কন্যা চমিখাকে বিবাহ করেন। চমিখার চৌজু, চৌপ্রু ও চৌতু নামে তিন জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ছিলো। তাদের মধ্যে চৌপ্রু শাসন করেছিলেন বলে জানা যায়। তবে কখন কোথায় তা সঠিক জানা নেই। যাই হোক- কনিষ্ট ভ্রাতা চৌতুর পুত্র ক্যাংঘরে মৈসাং (শ্রমণ) হন। যখন মেঙ্গদির অত্যাচারে স্বজন

** অক্সারাজার বলতে বার্মা রাজাদেরকে বুঝায়।*

নিয়ে পালাতে শুরু করতে লাগলেন তখন মৈসাংকে গোচরীভূত করা হয়েছিলো ঃ-

যেই যেই বাপ ভাই যেই যেই যেই
চম্পক নগরত্ ফিরি যেই
এলে মৈসাং লালস নাই
ন-এলে মৈসাং কেলেস নাই॥
ঘরত্ থেলে মগে পায়
ঝাড়ত্ গেলে বাঘে পায়
মগে ন পেলে বাঘে পায়
বাঘে ন পেলে মগে পায়॥

অতঃপর আরাকানে বসবাসরত দৈনাক নামে জাতিরা প্রাণের ভয়ে চট্টগ্রামের দিকে পালিয়ে আসেন। উক্ত সময়ে উত্তর চট্টগ্রামে স্বজাতীয় লোকের বসবাস ছিলো। তাদের মধ্যে দলপতি মোগলের অনুকুলে খাঁ উপাধি ধারণ করে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র এলাকা শাসন করতেন। মোগলের অধীনে সেসব শাসনকর্তাকে রাজাও বলা হতো। যাই হোক আরাকান থেকে পালিয়ে আসার সময় অনেকেই লাল বা খয়ের বর্ণ এক টুকরা কাপড় খণ্ড শরীরে পেচিয়ে মৈসাং অর্থাৎ বৌদ্ধ শ্রমণ সেজে ছদ্মবেশ ধারণ করেন এবং দীর্ঘপথ অতিক্রম করেন। কেননা অক্সা নামে লোকেরা বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী। সুতরাং লাল খয়েরী বর্ণের পোষাক ও মুণ্ডিত মস্তক দেখলে তারা আক্রমণ করতো না। আত্মরক্ষার জন্য পালিয়ে আসা ওসব মৈসাং বেশধারী অনেকেই ওভাবে থেকে যায়। চট্টগ্রামের বাঙ্গালীরা তাদেরকে ডাকতো **রোলী***। পরবর্তীতে এঁরা চাকমা জাতীর একমাত্র ধর্মীয় পুরোহিত **লাউরী** রামে সমাদৃত হন বলে মহাপণ্ডিত কৃপাচরণ মহাস্থবির কর্তৃক সম্পাদিত ও কলিকাতা থেকে প্রকাশিত 'জগজ্জ্যোতি' (১৯৯৭) পত্রিকায় উল্লেখ রয়েছে।

চাকমা রাজন্যবর্গ ও তাদের ধারাবাহিক ইতিহাস পর্যালোচনা করলে সহজেই প্রতীয়মান হয় যে, রাজা বিচগ্রী থেকে শুরু করে সাত্তুয়া (পাগালা রাজা) পর্যন্ত যেসব রাজা ছিলেন তারা **'রোয়াঙ্যা'** চাংমা। আর ধাবানা থেকে বর্তমান সময়ের রাজা পর্যন্ত **আনক্যা** চাংমা নামে পরিচিত। তঞ্চঙ্গ্যা পরিচিতি লেখক শ্রী যোগেশ চন্দ্র তঞ্চঙ্গ্যার মতে চন্দ্রঘোনার দক্ষিণ পূর্ব বা চট্টগ্রামের শঙ্খ নদীর দক্ষিণে রোয়াং বা আরাকান পর্যন্ত বসবাসকারী গনেরা **'টংসা'** (আরাকানের ভাষায় টং অর্থ দক্ষিণ বা পাহাড়, **সা** অর্থ সন্তান, সা অর্থ চাংমা)। এর অর্থ এই হতে পারে পূর্বদিকের পাহাড়ী সন্তান বা পূর্ব দিকের পাহাড়ী চাংমা। আবার চট্টগ্রামের উত্তরাঞ্চলের বসবাসরত অধিবাসীদেরকে বলা হতো **'আনক্-সা'**। আনক্ অর্থ আরাকানীদের ভাষায় পশ্চিম। আনক-সা অর্থ পশ্চিম কুলের চাংমা। এ ব্যাপারে শ্রী অশোক কুমার দেওয়ান মহোদয়ের পুরোপুরি

** বাংলাদেশ বৌদ্ধ ধর্মে মহাস্থবিরের অবদান পুস্তকের মতে রাউলী শব্দটি এসেছে আউলিয়া থেকে। মুসলমানরা তাদের ধর্ম প্রচারকগণকে আউলিয়া সম্বোধন করতেন।*

একমত রয়েছে। তিনি মন্তব্য করেছিলেন চৌদ্দ শতকের আগে আমাদের পূর্ব পুরুষের পরিচয় ছিলো ওভাবে। চাকমা ও তঞ্চঙ্গ্যা পরিচয়ে নয়। তিনি ইহাও মন্তব্য করেন, ধাবানা রাজা হয়ে চট্টগ্রামের উত্তরাঞ্চলে স্বজাতিদেরকে নিয়ে চাংমা জাতির সমাজ সংস্কার করতে গিয়ে চাকমা* নামে স্বতন্ত্র করার প্রবিষ্ট হয়েছিলেন।

যতোই অস্বীকার করি না কেন, আমাদের ইতিহাস ও ঐতিহ্য সৃষ্টি হয় আরাকান থেকে চট্টগ্রাম পর্যন্ত। আমাদের পূর্ব পুরুষের আগমন আচরণ ও অবস্থান দেখে আরাকানীরা হেঁয়ালিভাবে বলতে শুরু করেছিলো চাংমাং বা চামা এবং তংসা। পরবর্তীতে বিভক্ত শব্দ দুটির মধ্যে একটি চাংমা/চাকমা, অপরটি তংচংয়্যা/তন্চংঙ্যা/ তঞ্চঙ্গ্যা রূপান্তরিত হয়। অনেকের দাবী মতে শাক্য থেকে চাকমা শব্দটি উৎপত্তি হয়েছিলো। লুইনের মতে চেইং পেংগো অর্থাৎ চম্পক নগর থেকে আগত বলেই চাকমা নাম ধারন করা হয়। বাবু সুরেন্দ্র লাল ত্রিপুরা উপজাতীয় গবেষণা পত্রিকার উদ্ধৃতি মতে, - এ বিশ্বাস বংশ পরম্পরায় চলে আসলেও এ ধারণা কেবল মাত্র অনুমান। ত্রিপুরা জাতির "রাজমালা" পুস্তকের মতে "অতীতে চাকমা সম্পর্কিত কোন তথ্য পাওয়া যায়নি। তাই চাকমা পরিচয়ের শব্দটি এখনও রহস্যাবৃত রয়ে গেছে। পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষে **'চাকমা'** নামের উল্লেখ পাওয়া যায় ত্রিপুরাদের প্রাচীন রাজমালা পুস্তকে।" রাজমালা প্রথম লহড়, ৩২ পৃষ্ঠা- কৈলাস চন্দ্র সিংহ।

ক্যাপ্টেন টি, এইচ লুইনের ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে পার্বত্য চট্টগ্রামের উপর লিখিত তথ্য মতে দেখা যায়, চট্টগ্রামের পার্বত্য অঞ্চলে যেসব উপজাতি বসবাস করে তাদের নিম্ন লিখিত নামে শ্রেণীতে বিভক্ত করা যেতে পারে। যথা ঃ-

১। **"খ্যংথা"** বা নদীর সন্তান। এরা নদীর তীরবর্তী স্থানে বসবাস করে বলে খ্যংথা নামে পরিচিত। তারা নিঃসন্দেহে আরাকানী বংশ উদ্ভূত, প্রাচীন আরাকানী উপভাষায় কথা বলে এবং সর্বক্ষেত্রে বৌদ্ধ ধর্মীয় রীতি নীতি অনুসরণ করে।

২। **"টং থা"** বা পাহাড়ের সন্তান। এরা মিশ্র জাতি উদ্ভূত। এদের মাতৃভাষা বাংলা, তবে নানা ধরনের উপভাষায় কথা বলে এবং সন্দেহাতীতভাবে খ্যংথাদের চাইতে অশিক্ষিত। এই শ্রেণীর মধ্যে ত্রিপুরা, চাক, খ্যাং ও মারমা তাদের গোষ্ঠি অন্তর্গত। খ্যংথাদের পাশাপাশি এরা বৌদ্ধ ধর্মের অনুসরণ করে।

খ্যংথা ও **টংথা** শব্দ দুটি আরাকানী ভাষার শব্দ। **খ্যং** অর্থ নদী, **টং** অর্থ পাহাড় এবং "থা" বা "সা" (tsa) অর্থ সন্তান বা পুত্র। পাহাড়ী উপজাতিয়দের চিহ্নিত করার জন্য এই সব জাতিগত নাম কেবল আরাকানী উপভাষী উপজাতিরাই এভাবে ব্যবহার করে।

** দক্ষিণ পূর্বাঞ্চলের দৈনাক তংচঙ্যাদেরকে ছাড়া।*

অন্যান্য উপজাতিরা নিজস্ব পদ্ধতিতে নিজেদের বা প্রতিবেশীদের পরিচয় দেয়।

পার্বত্য চট্টগ্রামের বসবাসরত পাহাড়ী উপজাতিয়দের বৃহত্তর অংশ নিঃসন্দেহে প্রায় দুই প্রজন্ম পূর্বে আরাকান থেকে এখানে আসে। চট্টগ্রাম কালেক্টরেটে রক্ষিত দলিল পত্রাদি ও ইতিহাস ঐতিহ্য একথা নিশ্চিন্তে বলা যায়। ১৮২৪ খৃঃ বার্মা যুদ্ধ সংঘটিত হয়। ওসময় পর্যন্ত উপজাতিয় বহু শরণার্থী আরাকান থেকে চট্টগ্রামের পার্বত্য অঞ্চলে প্রবেশ করে। উক্ত সময়ের আগে পার্বত্য চট্টগ্রামে ত্রিপুরা, মগ, চাকমা, তঞ্চঙ্গ্যা, খ্যাং, মুরুং, চাক, খুমি ছাড়া অন্য কোন জাতি ছিলো না।

তৈনচংয়্যা / তংচয়্যা এই উচ্চারিত শব্দটি আরাকানে বা আলিকদমে বসবাসের সময় হতে শুরু হয়। প্রতীয়মান হয় যে, আরাকানে অবস্থানরত বহু চাপ্রে অর্থাৎ চাংমা নামের লোকেরা এককালে তৈনছড়ী কিংবা তৈগাঙ এলাকায় এসে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন। ১৫১৬ খ্রীষ্টাব্দের দিকে তৈন সুরেশ্বরী নামে দক্ষিণাঞ্চরের রাজা ছিলেন। এই তৈন থেকে তৈনছড়ী নামের একটি নদীর নাম হয়েছিলো বলে স্থানীয় প্রবীনদের মতামত রয়েছে। আবার ত্রিপুরা জাতির ভাষায় গাং, নদীকে **'তৈ'** বলা হয়। সুতরাং রাজা তৈন সুরেশ্বরী ত্রিপুরা ছিলেন। ত্রিপুরাদের মধ্যে এখনো রোয়াংগ্যা ত্রিপুরা ও আনক ত্রিপুরা নামে শব্দটি প্রচলন রয়েছে। যাইহোক **'তৈ'** হতে তৈনচংয়্যা শব্দটির উৎপত্তি একথাও পুরোপুরিভাবে ভুল নয়। কেননা ত্রিপুরা জাতির গাবিছা সম্প্রদায়ের মহিলাগণের পড়নের পিন্ধন ও বুক কাপড় আর তঞ্চঙ্গ্যা মহিলাগণের পড়নের পিন্ধন ও বুক কাজড় সম্পূর্ণরূপে মিল রয়েছে। শ্রী মাধবচন্দ্র চাকমা রচিত "শ্রী শ্রী রাজনামা বা চাকমা রাজন্যবর্গ*" পুস্তিকায় আংশিক উদ্ধৃত মতে জানা যায়, চাকমারা দুটি অংশে বিভক্ত। একটি রোয়াংগ্যা চাকমা ও অপরটি আনক্যা চাকমা।

তঞ্চঙ্গ্যা ও চাকমা পূর্বে অভিন্ন সম্প্রদায় ছিলো। রাজা হিসাবে ধাবানা শাসনকালে 'চাকমা' নামে পৃথক একটি জাতির সংস্কার গড়ে তোলেন বলে উপজাতীয় গবেষণা পত্রিকা থেকে ইঙ্গিত পাওয়া যায়। তবে তার আগে তঞ্চঙ্গ্যা ও চাকমা নামের শব্দটি কি নামের সম্বোধন ছিলো তা গবেষকগণ ব্যক্ত করতে পারেননি। আমাদের এ জাতিরা পূর্বে কথা-বার্তা, গঠন প্রণালী, পূজা অর্চনা, বিষু উৎসব, জন্ম, বিবাহের চুম্‌লাং, পোষাক পরিচ্ছেদ, সামাজিক ও পারিবারিক রীতিনীতি আসামের অহমীয়দের প্রাচীন সংস্কারের সাথে অনেকাংশে মিল ছিলো একথা প্রমাণিত করেছিলেন। তঞ্চঙ্গ্যাগণ শত শত বৎসর আরাকানে অতিবাহিত করেছিলেন এবং তথাকার কৃষ্টি সংস্কৃতি অনুসরণ ও অনুকরণ করেছিলেন। কিন্তু তাদের পূর্ব পুরুষের অতীত বৈশিষ্ট্যতা হারিয়ে ফেলেননি। বার্মা সরকার বর্তমান সময়ে তাদেরকে চাকমা জাতি স্বীকৃতি দিয়ে পূর্ণ মর্যাদা দিয়ে

আসছে বলে প্রত্যক্ষভাবে জানা যায়।

মোগলের অধীনে চট্টগ্রামের উপর খণ্ড খণ্ড শাসন কর্তা ছিলেন। তাঁদের মধ্যে চাকমা রাজা নামে কথিত এমন শাসক হিসাবে যাঁরা পার্বত্য জাতির উপর নেতৃত্ব দিয়েছিলেন তাঁরা সবাই ভাগ্যদেবতা বলা যায়। তাঁরা মোগলের সাথে হৃদয়বন্ধনের ফলে অনুকম্পা লাভ করেন এবং **'খাঁ'** পদবী ধারণ করে ইংরেজ আমল পর্যন্ত তাদের প্রভূত্ব বিকাশ পায়। যার কারণে ক্ষমতায়, সুযোগে, শিক্ষায় এমনকি দর্পেও বিস্তার পায়। ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, পনের শতকের পর তঞ্চঙ্গ্যারা আলাদা ও পরিত্যক্ত জাতিরূপে বিবেচিত হয়। এরপর তাদের অভিযাত্রী জীবন প্রবাহ নিভে যেতে শুরু করে, এ জাতির ইতিহাস বিহীন করুণ আর্তনাদ নিরবে নিভৃতে মিলিয়ে যায় দূর বন পাহাড়ে।

আরাকানের ভুসিডং, রাচিডং, মংদু, ক্যক্ত, তানদুয়ে, মাম্রা সহ আর কয়েকটি এলাকায় চাকমা নামের তঞ্চঙ্গ্যাদের গোষ্ঠী গোজার লোক প্রাচীনকাল থেকেই বসবাস করে আসছে। চট্টগ্রামের দক্ষিণ পূর্বাঞ্চলের কক্সবাজার জেলাধীন রামু,উখিয়া ও টেকনাফ থানায় এবং বান্দরবান জেলায় নাক্ষ্যংছড়ি ও আলিকদমে এখনো তঞ্চঙ্গ্যাদের পূর্ব পুরুষগণ বসবাস করে রয়েছেন। ইতিহাসের তথ্য মতে তারাই দিগ্বীজয়ী রাজা বিচগ্রী (বিজয়গ্রী), সেনাপতি রাধামন, জয়রাম ও নিলংধন নামের উত্তরসুরি বংশধর বা যোদ্ধার বংশধর ছিলেন। যুদ্ধাভিযানে অগ্রসর হয়ে তারা আরাকানে ও তার আশে-পাশে বসবাস শুরু করেছিলেন। তঞ্চঙ্গ্যাদের আগমন চাকমা রাজা নামে খ্যাত ধরমবক্স খাঁ আমল পর্যন্ত বলবৎ ছিলো।

ধরমবক্স খাঁ ওসব আগমনকারীদেরকে স্বজাতি বলে গ্রহণ না করার পেছনে উক্ত সময়ে কিছু কিছু প্রভাবশালীগণের কঠিন বাধা ছিলো বলে জানা যায়। আগমনকারীদের উপর যথেচ্ছা চুরি ডাকাতি ও জুলুম করা হয়েছিলো বলে শোনা গিয়েছে। যার কারণে তারা দলবদ্ধভাবে রাইংখ্যং, কাপ্তাই, সুবলঙের উজানে, ঠেগা, শঙ্খ শেষপ্রান্তে, ত্রিপুরায়, লুসাই হিলে এমনকি পুনঃ মাতামুহুরী ও আরাকানে চলে যেতে বাধ্য হন। চাকমাগণ উক্ত সময়ে তঞ্চঙ্গ্যাদেরকে অভিহিত করতেন পরঙী অর্থাৎ বসবাসের জন্য আগমনকারী।

ক্যাপ্টেন টি এইচ লুইন কর্তৃক লিখিত পুস্তক THE HILL TRACTS OF CHITTAGONG AND DWELLERS THEREIN (1869) মতে ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে এ জেলায় তঞ্চঙ্গ্যাদের জনসংখ্যা ছিলো ২৮০০জন। এদের মধ্যে অনেক বয়স্ক ব্যক্তি আরাকানী ভাষায় কথা বলতে পারে কিন্তু নতুন প্রজন্ম বৃহৎ অংশের সাথে মিশে যাচ্ছে আর এক বিকৃত ধরনের বাংলা ভাষা তাদের যোগাযোগের মাধ্যম হিসাবে প্রাধান্য লাভ করেছে। এরা কিন্তু সকলেই বৌদ্ধধর্মাবলম্বী, ধর্ম চ্যুত হয়নি, তবে প্রকৃতি পূজারী একথাও নিঃসন্দেহে বলা চলে। তিনি আরও উদ্ধৃতি দিয়েছেন ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দের দিকে চাকমা রাজা ধরমবক্স খাঁ আমলে ৪,০০০ জন তঞ্চঙ্গ্যা পার্বত্য চট্টগ্রামে আগমন

করেন। এদলের রাজা ছিলেন ফাপ্রু। স্থায়ী বসবাসের জন্য তিনি তার দলের প্রত্যেকের কাছে চাঁদা উঠিয়ে পর্তুগীজদের নির্মিত চট্টগ্রামের 'লাল কুঠির' ক্রয় করে ধরমবক্স খাঁকে উপহার দিয়েছিলেন বলে এখনও কথিত রয়েছে।

আরাকানের ভুসিডং এলাকা থেকে আগত ধল্যা চাকমা* অভিমত ব্যক্ত করেন, চাকমা রাজা হিসাবে ধরমবক্স খাঁন যখন রাজা হলেন এই সংবাদে খুশি হয়ে সংথাইং আমু নামে জনৈক বিত্তশালী ও দলের নেতা হিসাবে আরাকান থেকে চট্টগ্রামে আগমন করেন এবং স্থায়ী বসবাসের জন্য রাজা ধরমবক্স খাঁনের সাথে সাক্ষাতের আবেদন জানান। কিন্তু ধরমবক্স খাঁন তার আবেদন প্রত্যাখ্যান করেন। নিজের ব্যক্তিত্ব ক্ষুন্ন হবার মনোভাবে তিনি আর দেরী না করে পুনঃ আরাকানের উদ্দেশ্যে গমন করেছিলেন। যাত্রার সময় বীরবেশে সিঙাল (গয়ালের কিংবা মহিষের শিং এর ধ্বনি) ও ঢোলক বাজিয়ে এ অঞ্চল ত্যাগ করেছিলেন বলে কথিত রয়েছে।

একইভাবে তঞ্চঙ্গ্যা জাতির নেতা শ্রীধন আমুর নেতৃত্বে ৩০০ শত তঞ্চঙ্গ্যা পরিবার পার্বত্য চট্টগ্রামে আগমন করেন। রাজা ধরমবক্স খাঁকে প্রচুর স্বর্ণ ও রৌপ্য উপঢৌকন দিয়ে বসবাসের সম্মতি লাভ করেন। পরঙী নামে এই তিনশত পরিবার সবাই সচ্ছল ছিলেন এবং তারা রাইংখ্যং নদীর তীরবর্তীতে পুনঃবসতি স্থাপন করেছিলেন। সচ্ছলতার কারণে তাদের উপর বার বার ডাকাতি লুটপাট করা হতো বলে বুড়া-বুড়িদের মুখে শোনা গিয়েছে।

চাকমা রাজা ধরমবক্স খাঁর আমলে তঞ্চঙ্গ্যাদের মধ্যে কিছু সংখ্যক লোক অন্যত্র চলে যাবার পেছনে আরও একটি ঘটনা রয়েছে। অগ্রহায়ন মাসের কোন একদিন তঞ্চঙ্গ্যাদের ধৈন্যা গছা আর কারবুয়া গছার লাপস্যা দলের মধ্যে উয়্যা পৈ নামে একটি সামাজিক অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে তুমুল সংঘর্ষ বাধে। ফলে উভয় পক্ষের বহু লোক হতাহত হয় এবং রাজ দরবারে বিচারের সম্মুখীন হন। এই ঘটনার পর অনেকেই অন্যত্র চলে যান। তাদের মধ্যে গছা ভিত্তিক দ্বন্দ্বের জন্য বিবাহ সাদি বন্ধ হয়ে যায়।

তঞ্চঙ্গ্যারা আরাকানের অধিবাসী, আরাকান থেকে চট্টগ্রামে এসেছিলো একথা পুরোপুরি সত্য নয়। তারা চট্টগ্রাম থেকে আরাকানের দিকে কিছু অংশ চলে গিয়ে দৈনাক সম্বোধিত হয়। অন্যদিকে চট্টগ্রামে এবং পার্বত্য চট্টগ্রামের দক্ষিণ পূর্বদিকে অধিকাংশ স্থানে তাদের স্বাধীনভাবে বসবাস ছিলো। অন্যান্য উপজাতীয়দের মতো নিজস্ব আইন শাসনের মধ্যে গভীর বনাঞ্চলে জুম চাষই ছিলো তাদের একমাত্র ভরসা।

* ধল্যা চাকমা (তঞ্চঙ্গ্যা) ৩রা জানুয়ারী ১৯৯৯ ইং রাঙামাটি আসেন। বাড়ী আরাকানের ভুসিডং ইউনিয়নের মিজং গং চো। বয়স ৫৫ বৎসর। ইতিহাস ও ঐতিহ্য বিষয়ে সুপণ্ডিত। বার্মা ভাষায় শিক্ষিত। চাকমা ও তঞ্চঙ্গ্যা বিষয়ে গবেষণার জন্য রাঙামাটিতে আসেন। ধল্যার মতে আরাকানে তাদের বসবাস প্রায় ৭ শত বৎসর। রাঙামাটিতে এসে চাকমাদের পোষাক, চেহারা, আচরণ দেখে অভিভূত হয়েছিলেন।

তাই তঞ্চঙ্গ্যাগণ মোগলধর্মী রাজার কিছু কিছু সামাজিক আইন মানতে রাজী ছিলো না। যেমনঃ (ক) কোন তঞ্চঙ্গ্যা রমনীর মৃত্যু হলে তাকে পশ্চিম দিকে মাথা রেখে পুড়িয়ে ফেলা। (খ) লুরী বা লাউরী নামের ধর্মগুরু দিয়ে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া কিংবা সামাজিক কর্মাদি করা। (গ) মহিলাগণের এক কানে পাঁচটি করে দুই কানে দশটি ছিদ্র করা, পড়নের পিনুইনের চাবুগী রাখার পার্থক্য ইত্যাদি। সম্ভবতঃ ওসব সামাজিক কিছু কিছু নিয়ন লঙ্ঘন করেছিলো বলে চাকমা রাজা উক্ত সময়ে তঞ্চঙ্গ্যাদেরকে স্বজাতি বলে স্বীকৃতি না দেয়ার অন্যতম কারণ বলা যেতে পারে।

আরাকানে অবস্থারত চাকমাগণ (তঞ্চঙ্গ্যাগণ) শাক্যবংশের উত্তরসূরী হিসাবে তদানিন্তন জেনারেল উনু প্রতি বৎসর এ জাতির দম্পতি রেঙ্গুনে আমন্ত্রণ জানিয়ে সম্বর্ধনা দিতেন। বর্তমান সময়েও আদিবাসী জাতি হিসাবে রকার তাদেরকে প্রতি বছর আমন্ত্রণ জানিয়ে রেঙ্গুনে শাক্যজাতির সম্মানে সম্বর্ধনা দিয়ে আসছে বলে জানা যায়। ধল্যা চাংমা বলেন, আরাকানে অবস্থানরত চাকমা নামে পরিচিত মুগছা, ধৈন্যাগছা, কারবুয়াগছা, ল্লাংগছা, মগলাগছা এবং অঙ্গ্যগছা ছাড়া কোন চাকমা গছা নেই। ১৯৮৫ ইং সনে লোকগণনায় দেখা গিয়েছিলো আরাকানে ৯২,৩০০ জন চাকমা (তঞ্চঙ্গ্যা) রয়েছে। ইহা ছাড়া ত্রিশ হাজারের মতো বার্মায় বসবাসের ফলে বর্তমানে তারা বার্মীজ সম্প্রদায়ের সাথে মিশে যান। তাদের মধ্যে বুড়াবুড়িরা কিছু কিছু তঞ্চঙ্গ্যা ভাষায় কথা বলতে পারে, ভুসিডং নিবাসী ধল্যা একথা বলেন।

চাকমা রাজা ধরমবক্স খাঁ খুবই প্রতিপত্তি সম্পন্ন রাজা ছিলেন। তাঁর শাসনের পরবর্তী কালের রাজাগণ পার্বত্য চট্টগ্রামের তঞ্চঙ্গ্যাগণের উপর অভিন্নতা মনোভাব ও সদাচারণ এমনকি বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত করেননি বলে জানা যায়। পার্বত্য চট্টগ্রামে যখন মৌজা নির্ধারন ও বন্টন করা হয় তখন পাঁচ জন তঞ্চঙ্গ্যাকে মৌজার হেডম্যান পদ দেয়া হয়েছিলো।

নিরহংকার, অসাম্প্রদায়িক ও ব্যক্তিত্বের অধিকারী রাজা ভূবন মোহন রায় শ্রেষ্ঠ কবি হিসাবে শ্রী পমলাধন তঞ্চঙ্গ্যাকে **'রাজকবি'** এবং শ্রেষ্ঠ উবাগীতের ধারক বাহক শ্রীজয় চন্দ্র তঞ্চঙ্গ্যা (কানাগিংখুলী) কে **'রাজগীংখুলী'** উপাধিতে ভূষিত করে প্রতি বছর রাজপূণ্যাহের উপলক্ষে রাজসভায় যোগ্যতার আসনে উপবিস্থ করে রাখতেন। তঞ্চঙ্গ্যা জাতির ও সময় শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি শ্রী কুঞ্জ মহাজন ও শ্রী খোক্কেয়া বৈদ্যের সাথে রাজা ভূবন মোহন রায় গভীর সম্পর্ক ছিলো বলে জানা যায়। রাজকুমার নলিনাক্ষ রায় স্বজাতির মেয়ে বিবাহ না করে জটিলাদেবী নামে তঞ্চঙ্গ্যা জাতির রমনীকে বিবাহ করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে আংটি পরিয়ে দেন। এ ব্যাপারে পাত্রমিত্র ও অন্যান্য স্বজনদের সাথে রাজা পরামর্শ করেন। কিন্তু তঞ্চঙ্গ্যাদের সাথে চাকমাগণের বৈবাহিক সম্পর্ক অসম্ভব ও অস্বাভাবিক বিধায় রাজবংশের মান সম্ভ্রম বিষয়েও বিবেচনা করে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ হয়ে যায়। নলিনাক্ষ রায়ের পর কুমার ত্রিদিব রায় রাজা হয়ে তঞ্চঙ্গ্যা জাতির ভিক্ষু শ্রীমৎ অগ্রবংশ স্থবিরকে **'রাজগুরু'** পদে অধিষ্ঠিত করে। পার্বত্য চট্টগ্রামের বৌদ্ধধর্ম উদিত হয় এবং ধর্ম বিস্তার এক অকল্পিত স্বাক্ষর বহন করে।

তঞ্চঙ্গ্যাদের সমতীত সংস্কৃতি

মোগল আগমনের পূর্বে এবং বৃটিশ শাসন অবধি পার্বত্য চট্টগ্রাম পৃথক কিংবা শাসকের শাসনের বর্হিভূত অঞ্চল ছিলো। উঁচু নিচু পাহাড়ের বুকে গভীর অরণ্য। দৈত্যের মতো আকাশ চুম্বী বিশাল গাছের ঘনবন। সে বনাঞ্চলে লতা বেষ্টিত জানা অজানা গাছের মধ্যে বিভিন্ন জাতের বাঁশ ঝাড়। গাছের মগডালে বসে ধনেশ পাখি, হরিকল, টিয়া, ময়না ইত্যাদি পাখিরা সকাল থেকে সন্ধ্যা অবধি গান গাইতো। নিচে বিচরণ করতো হাতি, বাঘ, ভল্লুক, হরিণ, বাইসন, গয়াল, বন্য মহিষ, বন্য শুকর এমনকি গণ্ডার ও বন মানুষ নামে জন্তুও। এরই মধ্যে বসবাস করতো পাহাড়ী জাতি। এপাড়া থেকে ওপাড়ার দূরত্ব ছিলো অনেক অনেক। পাহাড়ের মাটি তখন খুবই উর্বর ছিলো। পাহাড়ীরা সামান্য জুম চাষ করে পেতো পুরো দু'বছরের খাবার ধান। ফলমূল, শাক সবজীতো কথাই নেই, ওসব জুমে পচে থাকতো। মানুষ ছিলো খুবই সরল, দয়ালু এবং সমবেদনাশীল। তাই চোর ডাকাত ছিলো না। তবে চাষের ফসল নষ্ট করতো বলে কিছু কিছু বন্য পশুদের উপদ্রব ছিলো। তাই গ্রামের সবাই নির্দিষ্ট একটি এলাকা জুড়ে জুম চাষ করতো।

অগ্রহায়ণ পৌষ মাসে পাহাড়ের ঘন বন কেটে চৈত্রের শেষে সেথা আগুনে পুড়িয়ে ফেলে এবং বৈশাখের প্রথম বৃষ্টির পানিতে যখন মাটি নরম করে দেয় তখন ধানের সাথে বিভিন্ন প্রকারের শাক সবজী ও ফল মূলের বীজ বুনা হয়ে থাকে। ভাদ্রের প্রথম দিকে জুমের ধান পাকতে শুরু করলে তখন **'তাগ'** (বন্য পশু পাখি তাড়ানো বাঁশের সাথে দড়ি বাঁধা টানা কল) কিংবা **ধুরুক** (তঞ্চঙ্গ্যাদের বাঁশের বাদ্য) বাজিয়ে জুমের ফসল রক্ষা করে। ধান কাটার পর সেগুলো জুমের টংঘরে মাড়াই করে ফেলে রেখে দেয় এবং এক সময় **রোয়াত** (গ্রামের বাড়িতে) নিয়ে আসা হয়।

ধান কাটার পর জুমকে রান্যা বলা হয়। রান্যায় কার্পাস তিল, লাউ, শসা, কুমড়া, জুমিয়া আলু, কচু, যবধান, জেরেনা, কাউন, মরিচ ইত্যাদি ছাড়াও ভরে থাকতো অপূর্ব সমারোহে জুমিয়া ফুল। জুমের টংঘর থেকে সমস্ত সঞ্চিত ধান গ্রামের বাড়িতে আনার পর মহাধুমধামে নবান্ন উৎসব করা হতো। এপাড়া ও পাড়ার লোকজন নিমন্ত্রণ করে বাঁশের পৈরাং বা মেচাঙের (ভোজনাসন, ভাতের থালা তুলে রাখার বেত) উপর আমন্ত্রিত অতিথিদেরকে ভাত খাওয়ানো হতো। অনেকেই নতুন ধানের চাউলের ভাত মুখে দেয়ার আগে ক্যাংঘরে অর্থাৎ বুদ্ধবিহারে **সোয়াইন্ (আক্ ভাত)** দান করতো। নবান্ন উৎসবে কেউ শুকর, কেউবা ছাগল মোরগের মাংস দিয়ে আপ্যায়ন করতো। তবে এসব আয়োজনে মদ জগা অবশ্যই থাকতে হয়।

শরতের স্নিগ্ধ পরশ ছড়িয়ে পড়ার সাথে সাথে সমস্ত পাহাড়ীয়া অঞ্চলের রমনীগণের শুরু হয় তুলা থেকে সুতা বের করার ব্যবস্থা। সারা গ্রামে চরকার একটানা কেঁ কেঁ শব্দ। অনেকে শুকনা বাঁশের মশাল জ্বালিয়ে রাত্রে ছড়ার উজান বেয়ে মাছ কাঁকড়া ধরতে যায়। আবার অনেকে এপাড়া ওপাড়ার যুবক যুবতীরা মিলিত হয়ে ঘিলা খেলায় নেমে পড়ে গর্জন তৈলের শিখা জ্বালিয়ে। আবার অনেকে রসিক পড়ুয়াকে দিয়ে বারমাস কিংবা পসন (কিস্‌সা) শোনার জন্যে ইচত্‌ (ঘরের দরজায় মাচাং) ভীড় জমে। বয়স্ক লোকেরা মদপান করতে করতে শিকারের গল্প, আগামী বছর কোন চাবত্‌ অর্থাৎ কোন স্থানে জুম চাষ করবে, কে কতো আড়ি ধান পেয়েছে, বিবাহ সম্পর্কীত ইত্যাদি সুখ দুঃখের কথা বিনিময় করতো। এভাবে আলাপের সাথে মদের আপ্যায়ন ও বৃদ্ধি পায়। ফলে তাদের মধ্যে উচ্চ চিৎকার এমনকি মারামারিও হয়ে থাকে।

তঞ্চঙ্গ্যাদের ধুরী পোই, খারী পোই, কান বেরা পোই ও ঔয়্যা পোই নামে সামাজিক অনুষ্ঠান হয়ে থাকে। সাধারণতঃ ওসব পারিবারিক ভাবে করা হয়। পোই অর্থ অর্ঘ বা পূজা। পুত্র সন্তানদের জন্য ধুরী পোই ও কন্যা সন্তানদের জন্য কান বেরা পোই, খারী পোই এবং পরিবারের জন্য ঔয়্যা পোই হয়ে থাকে। এ ধরনের অনুষ্ঠানে সাধ্যানুসারে দুই চারটি শুকর, বিশ চল্লিশটি মোরগ এবং প্রচুর পরিমাণে মদ, জগা, কাইঞ্চো, ফুসী প্রয়োজন হয়। অনেকেই মহিষ দিয়ে পোই করে থাকে। তবে মদ, কাইঞ্চো ইত্যাদি ছাড়াও মোরগ অবশ্যই প্রয়োজন হয়।

পোই করতে হলে সেদিন প্রথমে আমন্ত্রিত অতিথিদেরকে শুধুমাত্র মাংস ইচ্ছে মতো খেতে দিতে হয়। এভাবে সবাই ইচ্ছে মতো রান্না করা মাংস খাওয়াটাকে বলে খাশি খাওয়া। এরপর যার উদ্দেশ্যে এই পোই করা হয়ে থাকে তাকে নতুন কাপড়ের সাদা জামা ও সাদা ধুতি এবং সাদা কাপড়ের খবং (পাগড়ী) মাথায় বেঁধে দিয়ে উপবিষ্ট লোকের সম্মুখে ষষ্টাঙ্গ প্রণাম দিয়ে থাকতে হয়। উপবিষ্ট লোকেরা তখন আর্শিবাদ স্বরূপ পোই এ (আর্শিবাদ) প্রদান করেন। তবে এক্ষেত্রে বয়সের জ্যেষ্ঠতা ও পদবীধারী কিংবা কনিষ্ঠ জন এই পার্থক্য নিয়ে ধরা বাধা রয়েছে। যেমন, পোই অর্পণ করা হয় সাধারণতঃ বয়স্ক বা মুরব্বীদের মধ্যে যিনি জ্যেষ্ঠ সেই ব্যক্তিকে। তিনি আর্শিবাদ স্বরূপ যতো টাকা বখশিস দেবেন তার পরবর্তী লোক তত টাকা দিতে পারবেন। প্রথম ব্যক্তির চেয়ে বেশী দিতে পারবেন না। যদি প্রথম জ্যেষ্ঠ ও সম্মানী ব্যক্তির চেয়ে বেশী টাকা প্রদান করেন তাহলে টাকার বাহাদুরী কিংবা প্রথম ব্যক্তির মানহানীর প্রতিবাদে বিবাদ এমনকি পক্ষ বিপক্ষ হয়ে মারামারিও হতে পারে।

সিবলী প্রদানকারীগণকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়ে থাকে। যেমন, **ম্যাংখোয়াইন্‌** (বিবাহিত), **রানা-রানী** (বিপত্নীক ও বিধবা) এবং **গাবুজ্যা-গাবুরী** (যুবক-যুবতী)। প্রতিটি দল আলাদাভাবে পোই পেয়ে থাকে এবং তাদের দলে যিনি সবার জ্যেষ্ঠ কিংবা সম্মানীত তিনিই সর্বপ্রথম পোই গ্রহণ করবেন এবং টাকা প্রদান করবেন।

এই ধরনের সিবলী পোই করার অনুষ্ঠানে খরচ প্রয়োজন হয়। দ্বৈত কিংবা একক গিংখুলী (গায়ক) একটানা উবাগীত গেয়ে অতিথি শ্রোতা বৃন্দদেরকে মনতুষ্টি করতেন এবং টাকা পেতেন। গিংখুলীর গীতের ফাঁকে শ্রোতারা রেইং (উল্লাস ধ্বনি) দিয়ে আত্মানুভুতিকে মেতে তুলতো।

জাতি ভেদে পাহাড়ীদের বিভিন্ন নিয়মে সামাজিক ও ধর্মীয় উৎসব হয়ে থাকে। তন্মধ্যে সামগ্রীকভাবে চৈত্র সংক্রান্তি উৎসবটি পালন করে থাকে সকল পাহাড়ী। চৈত্র সংক্রান্তি উৎসবটি তঞ্চঙ্গ্যাদের ভাষায় বলা হয় **'বিষু'**। চৈত্রের শেষ দিন এবং বৈশাখের প্রথম দিন এই দুই দিন 'ফুল বিষু ও মূল বিষু' যথাযোগ্য মর্যাদায় পালন করে থাকে। ফুল বিষুর দিন ফুল সংগ্রহ করে ক্যাংঘরে, বাড়িতে ও নদীতে সুন্দর ভাবে সাজিয়ে দেয়া হয়ে থাকে। এদিন বাড়িতে বাড়িতে মুপিঠা, সান্যা পিঠা, কলাপিঠা ও কোইন্ ভাত তৈরী হয়ে থাকে। ক্যাংঘরে সোয়াইন্ দেয়া, অষ্টশীল পঞ্চশীল গ্রহণ করা হয়। বিদায়ী পুরাতন বর্ষকে বিদায় দিতে অনেকে গুরুজন কিংবা বয়স্কদের নিকট ক্ষমা চেয়ে নিতো। বৈশাখের প্রথম দিন মূল বিষুর দিনে ক্যাংঘরে বুদ্ধ মূর্তি স্নান করানোর পর ভিক্ষুদের এবং গুরুজন সবাইকে স্নান করানো হতো। তবে বিষু ধর্মীয় উৎসব নয়, সামাজিক উৎসব বলে দুটি দিন মদ, জগা, কাইঞ্চো, ফুসী এমন নেশা দ্রব্য অনেকে পান করে থাকে। তঞ্চঙ্গ্যাদের বিষুর দিনে সবচেয়ে আকর্ষনীয় উপভোগ হলো যুবক-যুবতীদের মিলে সারারাত ব্যাপী ঘিলাখেলা প্রতিযোগিতা।

ঘিলাখেলা সাধারণত পাঁচ প্রকারে হয়ে থাকে। যেমন, **মক্‌খেলা, কুইচুক্ খেলা, গামাইত্ খেলা, ব্যংখেলা** ও **পাইচে** খেলা। সমতল বড় একটি পরিস্কার উঠানে সমান সংখ্যক লোকের দু'দলে এ খেলা হয়ে থাকে। মেয়েরা কুইচুক্ খেলা খেলতে পছন্দ করে। অন্য খেলাগুলোর মধ্যে পা উপরে তুলে বা জোর দিয়ে ঘিলা ছুঁড়তে হয় বলে তারা লজ্জা পায়। একদল অপর দলকে পরাজয় করলে 'বোই' ধরা হয়। ঘিলাখেলার নিয়ম কানুন, কলাকৌশল খুবই আকর্ষনীয়, উপভোগ্য আর আনন্দঘন।

চ্যাপ্টা ও পেচানো এবং অনেকাংশে সাপের ফণার মতো ঘিলালতার জন্ম হয় গভীর বনে। এক একটা ঘিলার তাগে অর্থাৎ ছড়ায় ৮-১০টিবা তারও বেশী ঘিলা থাকে। অনেক সময় একটি তাগে ২০-২৫টি পর্যন্ত ঘিলা দেখা গিয়েছে। বীজ পাকলে খুবই শক্ত হয়। গৌরিক বর্ণের এবং চাকার মতো গোলাকৃতি প্রতিটি ঘিলা ১৫-১৮ সেন্টিমিটার হয়। আমাদের সংস্কৃতি ও কৃষ্টি ধারক গিংখুলীদের উক্তি মতে প্রাচীনকালে ঘিলালতায় সৌরভযুক্ত ফুল ছিলো। একদিন ঘিলাখেলা প্রতিযোগিতায় রাধামন নামে জনৈক যুবকের নিক্ষিপ্ত ঘিলা প্রেমময়ী ধনপুরীর পরনের পিনুইনের গভীর অংশে ঢুকে পড়ে। ও সময় ধনপুরীর রজস্বলা ছিলো। এই অপ্রত্যাশিত ঘটনায় ধনপুরী খুবই লজ্জা পেলেন এবং ঘিলার উপর অভিশাপ দিলেন যেন ঘিলালতায় কোন ফুল না ফোটে। পাহাড়ীদের অনেকের বিশ্বাস, ঘিলা পবিত্র এবং লতায় দেবংশী অর্থাৎ দৈবাত্মা নিহিত রয়েছে।

তঞ্চঙ্গ্যাদের ঐতিহ্যবাহী ঘিলাখেলা ছাড়াও রয়েছে গয়াং খেলা, পুত্তি খেলা, গুদু খেলা, বুলি খেলা, আংগী খেলা, লুগালুগি খেলা, কক্কেমা বা খাবামা খেলা, নারেং খেলা ইত্যাদি। চেয়ারম্যান, স্থানীয় সরকার পরিষদ, বান্দরবান কর্তৃক তঞ্চঙ্গ্যাদের ঘিলাখেলা সংস্কৃতিকে ধরে রাখার জন্য ১৯৯৩ ইং সনে একটি স্বর্ণকাপ প্রদান করেছিলেন। প্রতি বছর বিষু উপলক্ষে জেলার বিভিন্ন এলাকা থেকে গাবুজ্যা গাবুরী ও ম্মাংখোয়ান্ দল ঘিলাখেলা প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করতে আসে। ইহা ছাড়াও তঞ্চঙ্গ্যাদের কৃষ্টি ও সংস্কৃতি পুনর্জীবিত করন এবং সম্প্রসারনের উদ্দেশ্যে 'উপজাতীয় সাংস্কৃতিক ইনষ্টিটিউট, বান্দরবান ১৯৯৬ ইং 'তঞ্চঙ্গ্যা সেমিনার আয়োজন করে তঞ্চঙ্গ্যা জাতির কৃতজ্ঞ ভাজন হয়েছে।

তঞ্চঙ্গ্যাদের ধর্মীয় অনুষ্ঠান গুলোর মধ্যে (১) **জারি** (স্তুপ), (২) **ম্রাংডং / শলা-ঘ** (প্রদীপঘর), (৩) **চ্যাপ্-ঘ** (পথচারীদের বিশ্রামাগার, পানি ঘর, পান্থশালা), (৪) বটবৃক্ষ উৎসর্গ, (৫) **শামনী** বা **শ্রমণ** হওয়া, (৬) **থামাং টং** (ভাত পাহাড় দান) এবং (৭) **ফারিক শোনা** (সূত্র শোনা)। এই সমস্ত ধর্মীয় কাজে প্রাণী হত্যা, মদ সম্পূর্ণ বর্জন থাকবে এবং নিরামিষ রান্না করে আমন্ত্রিত অতিথিদের খাওয়ানো হয়।

তঞ্চঙ্গ্যাগণ মূলতঃ বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী হলেও অন্যান্য উপজাতীয়দের মতো প্রকৃতি পূজারী বললে ভুল নয়। ভূত পূজা, কে পূজা, মিত্তিনী পূজা, চুমুলাং পূজা, গঙাপূজা, মাড়া ধয়ানা, ধান হ্আত্ দেনা, মা লক্ষী ভাত দেনা ইত্যাদি শুভ অশুভ পূজার জন্য শুকর, ছাগল, মুরগী, হাঁস ও কবুতর বধ করে আসছে। সিন্নি পূজা (সত্য নারায়নের পূজা বা সত্য পীরের পূজা) এবং ফুগির পূজা (পীর ফকির বা সন্ন্যাসী পূজা) এই দুটি পূজায় কোন জীববধ করা হয়না। নারিকেল, কলা, ইক্ষু, গুড়, পান সুপারী, পিঠা জাতীয়, দধি এবং পাকা ফলাদি দ্বারা পূজা করা হয়। সিন্নি পূজা ঘরে এবং ফুগির পূজা গভীর জংগলে যেখানে মানুষের সাড়া শব্দ শোনা যায়না এমন স্থানে করা হয়। বর্তমানে ওসব পূজা একেবারেই নেই তা নয়, গ্রামাঞ্চলে অশিক্ষিত মিথ্যুক বৈদ্য ওঝাদের প্রলোভনে এখনও অবুঝ তঞ্চঙ্গ্যা এ সংস্কার থেকে মুক্ত নয়।

গিংখুলী সাধারণত সামাজিক অনুষ্ঠানে গীত গেয়ে থাকেন। তারা রাধামন ধনপুরীর প্রেমের কাহিনী, লাঙ্যা-লাঙনী, বিচগ্রী রাজা রোয়াং অভিযান তথা অক্সাদেশ জয়ের গৌরবগীতি পালা গাইতেন। তাদের উবাগীতের জন্য একমাত্র বাদ্য হচ্ছে বেহালা। তঞ্চঙ্গ্যাদের বহু খ্যাতনামা গিংখুলী আবির্ভাব হয়েছিলেন। তন্মধ্যে রাজগিংখুলী জয় চন্দ্র (কানা গিংখুলী), কালা মোহন, বীর, কিত্তং, রুচী অং, শশী অং, পংচান, দুমপ্রু, মেন্দ, ভাগ্য কুমার, বিচকধন, গড়াচান, কক্কিলা, যতীন্দ্র খুবই কৃতিত্ব অর্জন করেছিলেন।

তঞ্চঙ্গ্যাদের সমতীত জীবন

তঞ্চঙ্গ্যা জাতিরা সাধারণত উঁচু মাচাং ঘরে বাস করে। জেইত্ ঘর, ভাতঘর ও টংঘর এই তিনটি ঘরের সমন্বয়ে তাদের পরিবার। কোম্বাই, জারুল, গুগুচ্যা, ভারি, কোকো বা শিলতেরোই এমন গাছের হাড় গাছের হ্আম অর্থাৎ খুঁটি দিয়ে ঘর তৈরী করতো। ওসব গাছের হ্আম প্রায় শত বছর পর্যন্ত টিকে। যার কারণে প্রবাদ আছে, 'ভারিয়ে আশি, জারুলে শত, কোম্বাইয়ে কয়, আচ্যা কাল্যা কড়া ক্যা কইত।' অর্থাৎ ভাদি গাছের থুনি আশি, জারুল গাছের শত, কোম্বাই গাছের থুনি আরও বহু বছর টিকে।

গৃহ নির্মাণের শুভ অশুভ দিন নির্ধারণ করা হয়ে থাকে। যেমন ঃ "সমে শুক্কুরে কুচং ধান, মঙ্গলে বুধে ঘরর্ কাম।" অর্থাৎ সোম শুক্রবারে ধান বুনা, মঙ্গলে বুধে ঘরের কাজ করা। দুই পাহাড়ের মধ্যবর্তী কিচিঙে ঘর করা নিষেধ রয়েছে। ছড়া বা ঝিড়ির শেষ প্রান্তে, গর্ত বা সুড়ঙ্গ থাকলে, পরিত্যক্ত ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে, শ্মশানের উপর, উই ভিটার উপর, হ্আচা বা নাগাঘিলু অর্থাৎ যে স্থানে লাল বর্ণের গলিত পানি নির্গত হয়, পশু পক্ষী মরা স্থানে, বাবা, জেঠা, কাকা ও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সম্মুখে গৃহ নির্মাণ করা অবিধেয়। ওসব স্থানে গৃহ নির্মাণ করলে পরিবারে দুর্নিমিত্ত হয় ইহা অতি প্রাচীনকাল থেকে বিশ্বাস করে আসছে।

গৃহ নির্মাণের সর্ব প্রথম যে হ্আম অর্থাৎ থুনি গর্তে বসানো হয় তাকে বলা হয় মুহ্আম্ বা মূল হ্আম। মূহ্আম্ গর্তে বসানোর পূর্বে গর্তের ভেতর সোনা, রূপা কিংবা তার পানি, চন্দনের পানি, ঘিলা কচোই এর পানি দিয়ে শুদ্ধ করে নিতে হয়। এরপর হ্আমের উপরে তীর সহ ধনুক, আম্র পল্লব, ছোট কলা গাছ বেঁধে দিতে হয়। এর অর্থ এই বাড়ীর উপর আকাশ হতে দেবতারা যাতে বিদ্যুৎপাত না ঘটায়। অনেক সময় গৃহ নির্মাণের আগে বৈদ্য কর্তৃক মন্ত্র পাঠ করে থাকেন এবং পাথরের উপর আং (দেবতার চিত্র) অংকন করে ঘরের চারদিকের চার কোণায় সে আং মাটিতে পুঁতে দেয়া হয়ে থাকে।

এককালে যেমন ছিলো সুখ সমৃদ্ধি তেমনি মানুষও ছিলো সত্যবাদী এবং দয়ালু। যার কারণে তন্ত্রমন্ত্রের জ্ঞান গুণ অব্যর্থ প্রমাণিত হয়েছিলো। কঠিন ব্যাধি থেকে আরোগ্য পাওয়া যেতো বনের গাছ-গাছালী ও লতাপাতা সেবনে। পোড়া মাটির ফলক কিংবা কালো পাথরের উপর আং (দেবতার জীবন চিত্র) অংকন করে সেটি মন্ত্র জপ করতে

করতে জীবন্ত করা হতো। মারণ, বশীকরণ, স্তম্ভন, সম্মোহন করা হয় এবং চিকিৎসা ও করা হতো এই আং দিয়ে। গ্রামে কিংবা পরিবারের দুর্নিমিত্তের আভাস পেলে আং রক্ষা করতে পারে এমন উক্তি এখনও শোনা যায়।

ল্লাপ্পোই, তাবিজ ধারণ করে অপদেবতাদের কবল থেকে আত্মরক্ষা, রাজমোহনী, যাদু টোনা, বাণ, পরী দৃষ্টি ইত্যাদির সুফল পাওয়া যায় বলে বৈদ্যরা বলে থাকেন। ঝাড়া, ফুক দিয়ে রোগীর জ্বর ও বিষ নামানো হয়। নখ দর্পন, আয়না দর্পন, বাঁশমলা ও মুরগীর ডিম দিয়ে পরিবারের শুভ অশুভ এবং রোগীর রোগ নির্ণয়, হারানো দ্রব্য সন্ধান পাওয়া সে বিশ্বাস তখনকার সময়ে খুব ছিলো; বর্তমানেও অনেকের রয়েছে। পানি পড়া, তৈল পড়া, সরিষা পড়া, চাউল পড়া, চুনপড়া, ধুলাপড়া, পানপড়া, ভাত পড়া, ফুলপড়া, শিঁকড় পড়া, থালপড়া ইত্যাদি ঝাড়া পড়া দিয়ে রোগী আরোগ্য লাভের খবর পাওয়া যায়। বৈদ্যদের ভুত চালান, গঙা চালান, ইবিলিস চালান, সিচি চাঁইম্বাক্ চালান, বাণ, টোনা ইত্যাদির চালান দিয়ে শত্রু বিনাশ হবার এমন প্রত্যক্ষ প্রমাণ এখনও রয়েছে। জ্ঞানতন্ত্র, বিষতন্ত্র, খেলতন্ত্র, ভোজবাজী, ভেল্কীবাজী ইত্যাদি ছাড়াও মারণ, বশীকরণ, স্তম্ভন ও সম্বোহণ বর্তমান বিজ্ঞান যুগেও রয়েছে বলে পাহাড়ীরা এখনও বিশ্বাস করে থাকে।

রোগ নিরুপন ও নিবারনে একমাত্র বৈদ্যগণের উপর ভরসা ছিলো। বৈদ্যদের মধ্যে যারা আত্ম সংযমব্রতী, শুদ্ধ বা পবিত্র ওসব তন্ত্রমন্ত্র তাঁদেরকে সুফল দেয়। মারণ ও ক্ষতিসাধন কাজে তাদের পাপ হয়। সাধারণত দেখা যায় বৈদ্যরা অধিকাংশই দরিদ্র এবং তাদের বংশ কম বৃদ্ধির প্রমাণিত হয়।

বৈদ্য সমাজের কবি শিবচরণ ছিলেন তেমনি এক তান্ত্রিকাচার্য এবং তালিক শাস্ত্রে সিদ্ধ পুরুষ। তাঁর রচিত 'গসাইন লামা' থেকে জানা যায় জন্ম ১১৮৪ সাল। উক্ত সময়ে মঘী বা মঘাব্দ সন প্রচলন ছিলো। এ হিসাবে ১৮২২ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর জন্ম হয়। পিতার নাম ধুংগ্রী এবং মাতার নাম কপুরী। বর্তমান রাজস্থলী থানাধীন কাপ্তাই নদীর পশ্চিম তীরস্থ হ্লারা নামক ছড়ার উপত্যকায় তাঁদের গ্রাম বলে জানা যায়। তিনি গসাইন লামায় উল্লেখ করেছিলেন, "সাকিন্ ছালাম য্যং মুই কাপ্তেই গাং, মানিয়া পুরীত্তুন তুমি যাং।" অর্থাৎ আমার সাকিন কাপ্তেই (কাপ্তাই) গাংকে ছালাম জানাচ্ছি, মনুষ্য ধরাধান থেকে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছি। তাঁর উত্তর সূরীদের মতে শিবচরণ ছিলেন মংলাগছা ও ল্লাংগছার মধ্যে বলা গুইত্তির লোক। তঞ্চঙ্গ্যা সম্প্রদায়ের বলা গুইত্তির লোক এখনও কাপ্তাই এলাকাতে বসবাস করে রয়েছেন।

তঞ্চঙ্গ্যাগণ GOD বা গসাইন্/গোসেন (তঞ্চঙ্গ্যাদের ভাষার উচ্চারণের চ ছ স শ ষ স্থলে চাকমাদের য জ ঝ) বলে সম্বোধন করে। চাকমা রাজা ব্যরিষ্টার দেবাশীষ রায় তাঁর GOD AND THE CHAKMA BUDDHIST প্রবন্ধে লিখেছিলেন ঃ ..... Another great even in his reign was the composition of the

"GOZEN LAMA" by the famous Chakma Poet and Spiritualist Shiv Charan. Gozen here Appears to have denoted God. Consider next the Tanchangya's (a sect of the Chakmas) beleif in "Gosain" by which tern there might Happily mean either the supreme being as an existing intelligence or Gotama,the founder of Buddhism.

তাঁর বক্তব্য অনুসারে তঞ্চঙ্গ্যারা ঈশ্বর বা বৌদ্ধ ধর্মের প্রবর্তক গৌতমকেই গসাইন বা গোসাইন্ বলে। বলা বাহুল্য এই 'গোজেন লামা' তঞ্চঙ্গ্যাদের ভাষার গোসাইন লামা। রাঙামাটি উপজাতীয় সাংস্কৃতিক ইনষ্টিটিউটের প্রাক্তন পরিচালক শ্রী অশোক কুমার দেওয়ান কর্তৃক সংগৃহীত চাকমা ভাষায় শব্দকোষে (উসাই এর ভারপ্রাপ্ত পরিচালক সুগত চাকমা কর্তৃক সম্পাদিত এবং উসাই রাঙ্গামাটি কর্তৃক ১৯৯৬ ইং সালে প্রকাশিত, প্রথম সংকলন) গোজেন শব্দটি অনুপস্থিত। যার কারণে গোজেন শব্দটি চাকমারা উচ্চারণ কিংবা ব্যবহার করেন না বলে মনে হয়। কাজেই 'গসাইন লামা' রচয়িতা কবিও সাধক শিবচরণ তিনি চাকমা ছিলেন বলে প্রমাণিত হয় না। কাপ্তাই এলাকাতে জন্ম, যৌবন, পদার্পন এবং ফুগির বেশে (সন্ন্যাসী বেশে) গৃহত্যাগ করেছিলেন বলে তাঁর দেহীছায়া এখনও দর্শন ঘটে বলে স্থানীয় জনগণের বিশ্বাস রয়েছে। যার কারণে এখনও বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী লোক মিলিত হয়ে রাজস্থলী এলাকায় ফুগীর পূজা করে আসছেন। পার্বত্য চট্টগ্রামের দক্ষিণ পূর্ব দিকের রামেক্তং পাহাড়ের উপর ছদ্মবেশী এই ফুগীরকে (সন্ন্যাসীকে) দর্শন পাবার খবর এবং পূর্ণিমা ও অমাবস্যার রজনী তিথিতে মং আর শিঙার ধ্বনি শোনার খবর সেখানকার বাসিন্দাগণ এখনও বলেন।

পার্বত্য চট্টগ্রামে এককালে হাটবাজার ছিল না বললেই চলে। বেচা কেনার জন্যে বড় বড় পাহাড় উঠা-নামা তো করতে হতো তদুপরি গভীর বনের হিংস্র প্রাণীকে ফাঁকি দিয়ে বাজারে যেতে আসতে লাগতো দিন কয়েক। তাই অনেকেই নিত্য প্রয়োজনীয় খাবার দ্রব্যাদি নিজেরাই তৈরী করতো। যেমন ঃ- কাঁচা ডলুবাঁশ, কাঁচা জংলী তাল গাছ, চ গাছ আগুনে পুড়িয়ে সেই ছাই এর ক্ষার (পটাশ) পানিতে ভিজিয়ে লবণাক্ত করা হতো। এই ক্ষারের পানি সকল পাহাড়ীরা লবনের পরিবর্তে ব্যবহার করতো। মাংস, মাছ, পিঠা কিংবা তরকারীতে শুকরের চর্বি অথবা তিল সরিষা পিষিয়ে দেয়া হতো। কেরোসিনের পরিবর্তে ব্যবহার করা হতো গর্জন গাছের তৈল। সহজে আগুন উৎপন্ন করা হয় শক্ত পাথর ঘর্ষন করে কিংবা শুকনা শক্ত ফালা বাঁশের নিচে কেরেট বেতের কঞ্চি দ্বারা দু'হাতে ঘন ঘন জোর টান দিয়ে। তরকারী সুগন্ধি ও স্বাদের জন্য বাখর পাতা, ফুসি, খ্যাংসাবাং বা ধানসাবাং, শিল আদা ব্যবহার করা হতো। রামসুপারী, চসুপারী, খসাগাছের শাল বা ফ'গাছের শালের সাথে জংলী জংলক্ একত্র করে পান দিয়ে খাওয়া যায়। মৈতাল নামে জংলী ছড়ায় এক প্রকার জংলী পান পাওয়া যায়। বত্তা

গাছের শালের রস দিয়ে ইরাকট তৈরী করা যায় এবং তা দিয়ে পান খাওয়া হতো। এই ঈরাকট শিশুদের চর্মরোগের ও পেটের অসুখের জন্য মহৌষদ। বাইলুম নামে এক প্রকার ছোট গাছের পাতা শুকিয়ে তামাক হিসাবে দাবা, পাইন্দুক ও চুরুট পান করা হতো। চলালতা, কোচোই এবং খুত্তোয়া গাছের লতা, ফুল ও বীজ এসবের দ্বারা কাপড় পরিষ্কার করা যায়। ক্যগাছের শাল সিদ্ধ করে স্ত্রী-লোকেরা মাথা পরিষ্কার করে থাকে। ইহা সুগন্ধ ও ফেনা হয় এবং বায়ুনাশক।

পাহাড়ীরা বনের বহু রকমের শাক-সবজী, ফল-মূল খেয়ে আসছে একথা অতি প্রাচীন। কোনটি কাঁচা খাওয়া যায়, কোনটি কাঁচা খাওয়া যায় না, আবার রান্না করেও খাওয়া যায় তা তারা জানে। অনেক শাক-সবজী বিষাক্ত। অথচ রান্না করে খেলে সুস্বাদু ও শরীরের জন্য উপকারীও। বর্তমান সময়ের কৃষি বিদদের গবেষণা মতে জানা যায়, বাঙ্গালীরা যেসব শাক-সবজী, ফল-মূল খেয়ে আসছে কিংবা চাষ করে আসছে ওসবের মধ্যে অধিকাংশই পাহাড়ীদের কাছ থেকে পাওয়া। এমনকি জংলী শাক-সবজী, ফল-মূল পাহাড়ীদের নিকট হতে সংগ্রহ করে খুবই আগ্রহের সাথে খাচ্ছে এবং বাজারেও বিক্রী করছে।

জুমিয়া পাহাড়ীদের জুমে উৎপাদিত হয় বহু রকমের শাক-সবজী রান্না করে খাওয়া হয়ে থাকলেও কিছু জুমিয়া সবজী কাঁচা খাওয়া হয়। রান্না ও কাঁচা খাওয়া হয়, যেমন- তিতা করলা, চিনার, মিষ্টি লাউ, লোগুলা-আন্দুক-মোগোই ও বাইত্ এই চার জাতের কদু, জুমিয়া মরিচ, বান্দম্মামা, ভেরোল গুলা, ব্যাগোল বিচি, তিবা আলু, শেমেই আলু, মুক্যা, জুম সমোই, পটোল ইত্যাদি। জংগলে অনেক ফল গাছ রয়েছে ওসব নিজেই জন্মে। অথচ ফল খুব সুস্বাদু, পুষ্টিকর বাজারে যথেষ্ট চাহিদাও রয়েছে। কিছু কিছু ফল গাছ লাগানো হয়ে থাকলেও তা খুব একটা যত্ন ও পরিচর্যা নেয়া হয় না, আপন গতিতে বড় হয়ে ফল দেয়। রোবক্কো গুলা, কোগুলা, মাল্যাং, মিঠা লেবু বা জাম্বুরা, কন্নালগুলা, বত্তা গুলা, চামানী কাট্টল, রামকলা, ছাক্রাগুলা, ঘে আম, জুমিয়া কলা, জাম, পান্যাং গুলা, চৈত্গুলা, বড় জগনা গুলা, কুসুম গুলা, গুগুচ্যা, কালামালা (আমলকি), বআগুলা (বহেরা), ঔট্যাল (হরিটকী) ইত্যাদি ফল পাহাড়ীদের প্রিয় হলেও এর উৎপাদন নেই। বাসুই, উলু, তাসেম, খনাগুলা, তোয়াথু, খাপ্পুলী আলু, মিশ্রী ফল ছাড়াও জংগলে বহু রকমের সবজী পাওয়া যায়। স্বাদযুক্ত তরকারী বলে ইদানীং বাঙ্গালীরাও খেতে খুবই পছন্দ করে।

বিভিন্ন কৌশলে তঞ্চঙ্গ্যারা ছোট নদী বা ছড়ার মাছ ধরে। 'দুব' নামে বাঁশের বেত দিয়ে তৈরী এক প্রকার খাঁচা দিয়ে মাছ, ইচা কাঁকড়া ধরা হয়ে থাকে। ইহা ছাড়াও 'কবামেল' নামক এক প্রকার জংলী গাছের শিকড় পিষিয়ে বড় ছড়ার উপরে ঢেলে দিলে সমস্ত ছড়ার মাছ নিস্তেজ হয়ে পড়ে এবং সহজেই ধরা যায়। ওচোন্শাক, করই

গাছের বাকল, ফুসি, চেঙেই তারা পিষিয়ে ছড়ায় ফেলে দিলে ছড়ার মাছ মরে যায়। তবে এই ধরনের মেল দিয়ে মাছ ধরা খুবই পাপ কাজ বলে বুড়া-বুড়িরা বলে থাকেন। ওভাবে ছড়ার মাছ মারতে গিয়ে অনেকের অমঙ্গলও দেখা গিয়েছে।

তঞ্চঙ্গ্যাগণের পশু-পাখি শিকার করার দক্ষতা অতি পুরনো কালের। তীর ধনুক, বাড়ুল, জাল ছাড়াও কেয়াব্, ঝাব্, ফাল্, ঈড়ি ইত্যাদি ফাঁদ বা কল দিয়ে পশু-পাখি শিকার করতে জানে। আড়াকাইন্ বা আঠা শলা, মুচ্চু বা ফুশলা এবং জাল দিয়ে পাখি শিকার করার অভ্যস্থ এককালে ছিলো। ইহা ছাড়া গৃহপালিত কুকুর দিয়ে জঙ্গলের গুই সাপ, সাপ, পাহাড়ীয়া কচ্ছপ, হরিণ ও বন্য শুকর ইত্যাদি শিকার করার দক্ষতা অতি প্রাচীন কাল থেকে।

তঞ্চঙ্গ্যারা কুকুর, বিড়াল, শৃগাল, চিল, কাক সহ কয়েক রকমের প্রাণী বা সরীসৃপ জাতীয় প্রাণী না খেলেও এককথায় উইপোকা থেকে হাতি পর্যন্ত খেয়ে আসছে। তাদের মধ্যে গরুর মাংস খাওয়া বাধা রয়েছে। তবে এটা শাস্ত্রের বাণী নয়। গরুর মাংস খাওয়া আর বাপ-মার মাংস খাওয়া পার্থক্য নয় এমন কথা বুড়া-বুড়িদের মুখে এখনও প্রচলিত রয়েছে।

তঞ্চঙ্গ্যা জাতির ইতিহাস, ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি বিষয়ক আরও অধিক বই পেতে আমাদের মেইল করুন ঃ chandrasen2014@gmail.com এই ঠিকানায়।

সমতীত নিদর্শন

বৃটিশ নিযুক্ত পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রথম ডেপুটি কমিশনার পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ী জনজীবনের উপর প্রথম লেখক এবং গবেষক টম হাবার্ট লেউইন (টি. এইচ. লুইন) তাঁর THE HILL TRACTS OF CHITTAGONG AND DWELLERS THEREIN (1869) পুস্তকে উল্লেখ করেছেন, চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রামের তিনটি বড় বড় নদীর নাম ছিলো ঃ

১। কাইন্সা খ্যং - কর্ণফুলী নদী
২। রিগ্রী খ্যং - সাংগু নদী
৩। মুরী খ্যং - মাতামুরী নদী

আবার সাংগু নদী তিনটি নামে পরিচিত ছিলো। যথা, উজানে রিগ্রী খ্যং, মধ্য ভাগে সবুক খ্যং এবং সমতল অংশের নাম সাংগু। তিনটি বড় বড় এই নদীর মোহনায় বা সমতল অংশের আশে পাশে বাস করতো মিশ্র জাতি। উপরের অংশে পাহাড়ীয়া জাতি। ও সময় বাজার ছিলো চন্দ্রঘোনা, রাঙ্গামাটি, বান্দরবান ও কাচালং এই চারটি স্থানে। ওসব বাজারে মহাজন নামে দোকানদারগণ বাঙ্গালী হিন্দু। আর ভাসান্যা বেপারী, কাঁধা বেপারীরা অধিকাংশই মুসলমান। ক্রেতা একমাত্র পাহাড়ী।

পাহাড়ীদের জীবন যাত্রা সমতল বাঙ্গালী জাতির চেয়ে সম্পূর্ণ ভিন্ন। বাঁচার জন্য একমাত্র জুম চাষই নির্ভর ছিলো। তারা শ্রম বিক্রী করে না, নিজেদের জন্য পরিশ্রম করে। এক বছরের খোরাকী পাবার জন্য জুম চাষ করে। খাবার থাকলে সেগুলো বসে বসে খায় ।টাকা উপার্জন করতে যেমন জানে না তেমনি ভবিষ্যতের জন্য টাকা সম্পত্তি জমা রাখা তাদের অভ্যাস নেই। তারা সহজে বিনয়াবনত হতে কিংবা পরের নিকট খোশামোদ করার অভ্যাস নেই। চাকুরী, ব্যবসা, শিল্পকর্ম ও দিন মজুর তাদের মধ্যে দেখা যায় না।

লুইনের মতে ১৮৬৭ সালে পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতীয় ব্যক্তিকে লাঙ্গল দিয়ে কৃষি কাজ করতে দেখেননি। তবে কোন কোন উপজাতীয় প্রধান বা সচ্ছল ব্যক্তির গ্রামে সামান্য কিছু পরিমাণ জমিতে লাঙ্গলের চাষ দেখা গেলেও অবধারিতভাবে বাঙ্গালী মজুর দ্বারা সম্পাদন হয়েছে বলে ধরে নিতে হবে। ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে পাহাড়ীদেরকে অধিক টাকার বিনিময়ে মজুরীর প্রস্তাব দিয়েও রাস্তা তৈরীর কাজ করতে রাজী করানো যায় নি। ফলে চট্টগ্রাম থেকে কম টাকা দিয়ে বাঙ্গালী লোক এনে কাজ সম্পাদন করা হয়েছিলো।

পাহাড়ীদের বাঁচার একমাত্র অবলম্বন হচ্ছে জুম চাষ আর কাট্টন্ (গভীর জংগলে দলবদ্ধভাবে প্রায় মাস ব্যাপী বাঁশ, গাছ, গলাক বেত ইত্যাদি সংগ্রহের জন্য যাওয়া) করা। জুমে এক আড়ি ধান (১৬ সের) বপন করলে সাধারণত ৩০-৫০ আড়ি ধান পাওয়া যেতো। উর্বরা মাটির জুমে ৮০-১০০ আড়ি ধান পাওয়া গিয়েছে বলে অভিমত রয়েছে। জুম থেকে উৎপাদিত তুলা, তিল, শসা, মিষ্টি কুমড়া, কাউন, যব, ধান এবং কাট্টানে গিয়ে বাঁশ, গাছ, নৌকা ছাড়াও কুরুপ পাতা, গলাক বেত, কেরেট বেত, গর্জন তৈল, পৈরাক গাছের শুকনা খণ্ড (ধুপ), এমনকি হরিণ, সাপ ইত্যাদি চামড়া এবং হাতির দাঁত বাজারে বিক্রী করতো। পাহাড়ীরা শাক-সবজী বিক্রী করতে লজ্জাবোধ করে।

লুইন তাঁর পুস্তকে লিখেছিলেন, "কোন কাল্পনিক নয়, আমি নিজে এইসব ঘটনা প্রত্যক্ষ করেছি যে, অর্থলোভী ও স্বার্থবাদী বাঙ্গালী মহাজনগণ স্থানীয় ভাষায় ঋণদাতাকে মহাজন অভিহিত করা হয়। তারা সরল পাহাড়ীদের চড়া সুদে ঋণ দিয়ে সর্বনাশ করেছে। চাষের ফসল খারাপ হলে বা দুঃসময়ে ঋণের জন্য দ্বারস্থ হলে তখন ধূর্ত মহাজন চড়া সুদে নিরক্ষর পাহাড়ীকে অঙ্গীকার পত্র হিসাবে সাদা কাগজে টিপসই করিয়ে নেয়, যে অঙ্গীকার পত্রে কি শর্ত থাকবে সে সম্পর্কে কোন ধারণা নেই। দেখা গেছে, ১০ টাকা ঋণ নিয়ে তোলা প্রতি এক আনা সুদে একমাসে সুদে-আসলে দশ টাকা দশ আনা স্থলে মহাজন ১০০ টাকা দাবী জানিয়েছে। এভাবে ঋণ গ্রহীতা অসম্মতি প্রকাশ করলে মহাজন আদালতে হাজির হয়ে অঙ্গীকার পত্রের শর্ত অনুযায়ী সুদ ও মামলার খরচ সহ ঋণের সম্পূর্ণ টাকা আদায়ের জন্য মামলা করে দেয়। যথারীতি পাহাড়ী ঋণ গ্রহীতাকে আদালতে হাজির হওয়ার শমন জারী হয়। এরই মধ্যে বাঙ্গালী মহাজন পেয়াদাকে ঘুষ দিলে পেয়াদা ঋণ গ্রহীতার বাড়ীতে না গিয়ে শমন জারী করা হয়েছে বলে আদালতে জানায়। যাতে সে পাহাড়ী ঋণ গ্রহীতা কোন সংবাদ না পায় এবং আদালতে হাজির না হওয়া বা আইন অমান্য কারণে হাজতে ঢুকতে হয়। এবারও মহাজন তার ঋণ গ্রহীতাকে প্রচুর খাতির দেখিয়ে আবারও চুক্তির মাধ্যমে আপোষের ও মামলা প্রত্যাহারের প্রস্তাব দেয় এবং তাকে ভুলিয়ে বাড়ীতে পাঠিয়ে দেয়।

পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ী ও চট্টগ্রামের বাঙ্গালীদের মধ্যে হৃদ্যতার বন্ধন ছিলো মোগল আমল থেকে। সাম্প্রদাযিক ভাব বা রাজনৈতিক কারণে তাদের মধ্যে কোন বচসা বা বিবাদ পাকিস্তান আমল পর্যন্ত ছিলোনা। চট্টগ্রামের পূর্বকালীন ইতিহাস বিদ্দের মতে, চট্টগ্রামের বাঙ্গালীরা অন্যান্য জেলার বাঙ্গালীদের সাথে ভাষায় ও সংস্কৃতিতে আলাদা। তারা অতি প্রাচীনকাল থেকে নিজেদেরকে চাদগাঁয়্যা পরিচিতি দিয়ে গর্ববোধ করতে শোনা যায়। সাধারণত এই চাদগাঁয়্যা নামের চট্টগ্রামের বাঙ্গালীরা অন্য জেলার বাঙ্গালীগণকে এককালে ঘৃণার চোখে দেখতো। চট্টগ্রামের আঞ্চলিক ভাষার সাথে

তঞ্চঙ্গ্যা ভাষার সাদৃশ্য দেয়া গেলো-

বাংলা শব্দ	তঞ্চঙ্গ্যা ভাষা	চাদগাঁয়্যা ভাষা
আমি	মুই	আঁই/মুই
তুমি	তুই	তুঁই
আস/আইস	আইস	আইয়্য
কাল	কাল্যা	কালুআ/কালুয়া
ভোরে	পয়াস্যা	পঁয়াত্ত্যা
সকালে	বিন্যা	বেইন্যা
সূর্য	বেল	বেইল্
সাঁঝ	সাচন্যা	হ্আজন্যা
সত্য	হ্অক্	হ্অক্
সন্তান	পোয়া	পোয়া
অতিথি	গর্বা	গর্বা
সব/সমস্ত	ব্যাক্কুন্	ব্যাগ্গুন
পাকা	পাগানা	পয়ানা
যাচ্ছিল	যাত্তোই/যারগৈ	যারগৈ
হাসি	হ্আসি	হ্আসি। ইত্যাদি ইত্যাদি।

পাহাড়ীরা বাঙ্গালীদের নিকট যুগ যুগ ধরে ঠকে আসলেও তারা লাভ করেছে লাঙ্গল দিয়ে চাষ করার শিক্ষা। চাষাবাদের প্রতি আত্মমনোনিবেশ হয়ে উঠার পর সমতল ভূমিতে চাষ করার জন্য প্রতি বছর বাঙ্গালী হাল্যা (মজুর) রাখা হতো। এই প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে, চন্দ্রঘোনার দক্ষিণ পূর্ব দিকে কাকড়াছড়ী নামক মৌজায় এককালে সম্পূর্ণ এলাকা জুড়ে পাহাড়ীদের বসবাস ছিলো। পাহাড়ীরা সমতল ভূমিতে লাঙ্গল চাষ করার জন্য বাঙ্গালী হাল্যা রাখতো। বাঙ্গালী অর্থাৎ বাঙ্গাল হাল্যা রেখে জমি চাষ করতো বলে এলাকাটি বাঙ্গালহাল্যা নামকরণ হয়ে থাকে। যাই হোক চট্টগ্রামের বাঙ্গালীরা পার্বত্য অঞ্চলে এভাবে হাল্যা কাজ করার জন্য প্রতি বছর দল বেঁধে আসতো। অনেকে ছোট ছোট নদীর উজান বেয়ে মালামাল বিক্রীর জন্য নৌকা দিয়ে আসতো। ওসব মালের মধ্যে লবণ, শুটকী, ন্নাপ্পী, মাটির তৈরী কলসী, লোহার দা ও কোদাল এবং মনোহারী জাতীয় সামগ্রী। আবার ফেরার পথে নিয়ে যেতো গরু, ছাগল, তুলা, তিল, আদা, হলুদ, কচু, কলা, শসা, চিনার, শন, বেত, জংলী তালপাতা, কুরুপ পাতা, গর্জন তৈল ইত্যাদি। কাঁধা বেপারী নামে বাঙ্গালীরা ছোট ছোট দোকান বসিয়ে মাল বিক্রী করতো। মেলায় কিংবা বাজারে 'বারশত তামাসা' (বায়োস্কোপ) নামে ছোট একটা বাক্সে বিভিন্ন ছবি দেখিয়ে পয়সা পেতো। গুটি খেলা, ফিতা খেলা এমনকি জুয়াখেলা বসাতো। আবার দেখা গিয়েছে শনের ঘেরা দিয়ে একটি ছোট প্যান্ডেল তৈরী করে তার মধ্যে ঢোলক, বেহালা, হারমোনিয়াম এবং জুরী বাজিয়ে কম বয়সী ছেলে শাড়ী পড়ে নাচ - গান করতো। টাকার বিনিময়ে পাহাড়ীরা সে তামাসা দেখতো। আবার

দর্শকদেরকে মনোরঞ্জনের জন্য ২/১ জন লোক সঙ সেজে বিভিন্ন কৌতুক দেখানো হতো। এভাবে এক একটি মেলায় তিন চার দল নাচগানের আসর বসিয়ে তামাসা দেখার জন্য সবিনয়ে আহ্বান করা হতো। দূর্গাপূজা, মনসাপূজা, কালীপূজা ইত্যাদি পূজার জন্য পাহাড় অঞ্চলের প্রতিটি ঘরে ঘরে গিয়ে চাঁদা হিসাবে টাকা কিংবা চাউল দাবী করতো সনাতনী হিন্দু ভক্তরা। ইহা ছাড়াও মন্দির নির্মাণ, বাপ-মার নামে সৎকর্ম, কন্যাদায়মুক্তি ইত্যাদির নামে একের পর এক করে চাঁদার জন্য পাহাড়ীদের ঘরে ঘরে যাতায়াত করতো।

লবিয়ত (আপ্যায়ন) শব্দটি পাহাড়ীদের মধ্যে তঞ্চঙ্গ্যা জাতির একটি বৈশিষ্ট্য। জুমের ধান যখন বাড়ীতে তোলা হয় তখন শরৎকাল। এ সময় পাহাড়ীগণের মধ্যে একজন অন্যজনের বাড়ীতে অতিথি হিসাবে আপ্যায়িত হতো। এই শরৎকাল আগমনের সাথে সাথে বৈরাগী, জটাধারী যোগী বা সন্ন্যাসী, বৈষ্ণব-বৈষ্ণবী পাহাড় অঞ্চলের গ্রামে গ্রামে অর্থ বা সাহায্যের জন্য আসতো। তাদের মধ্যে অনেকে কাশী, বৃন্দাবন, নবদ্বীপ, সীতাকুণ্ড ইত্যাদি তীর্থস্থানে পূজা মানস সমাধা করার জন্য অর্থ সাহায্য চাইতো। বৈষ্ণব-বৈষ্ণবীরা একতারা ও খঞ্জনী বাজিয়ে ভিক্ষা চাইতো। নবজাতকের সন্ধানে ব্রাহ্মণ নামে হিন্দু পুরোহিতরা আসতো ঠিকুজী অর্থাৎ কুষ্ঠী তৈরীর অগ্রীম টাকা বায়না নিতে। শুভ অশুভ, ভাগ্য গণনা, শনি রাহু দশা ও গ্রহ ইত্যাদি পূজা করার প্রলোভন দিয়ে তারা ভাল টাকা পেতো। তঞ্চঙ্গ্যারা ওসব ব্রাহ্মণদেরকে বলতো ভাত্তোয়া বাবন।

ডোম সম্প্রদায়ের লোকেরা পাহাড়ীদের গ্রামের প্রতিটি ঘরে ঘরে গিয়ে সিদা চাইতো ঢোলক সানাই ও জুরি বাজিয়ে। মুসলমানের পুঁথি থেকে গাজী কালু চম্পাবতী, মালকাবানু-শাহজাদা এমরান, দেব মুলুক সামারোক ভেলুয়া সুন্দরী ইত্যাদি উপাখ্যানের পালা অবলম্বন করে রাত ব্যাপী নাচ গান পরিবেশিত করতো গাজীদল নামের লোকেরা। ওসব পালায় প্রেম-বিরহ-বেদনা যুদ্ধ ও উপদেশমূলক। এমনও দেখা গেছে, কোন তঞ্চঙ্গ্যার ঘরে পুত্র সন্তান জন্ম হয়ে থাকলে সে সন্তান মঙ্গল কামনায় এ ধরনের গাজী গানের পালার আসর হতো এবং গাজী নবজাত সন্তানকে দোয়া করতো। এরপর লোকজন আমন্ত্রণ করে উৎকৃষ্ট ব্যঞ্জনাদি দ্বারা ভাত খাওয়ানো হতো। শীত আগমনের সাথে সাথে পাহাড় অঞ্চলে আরও আসতো যাত্রাদল। পঞ্চম অংকের পৌরাণিক নাটক দেখাতো খোলা উঠানে। কবিয়াল আসতো কবিগানের আসর জমাতে। অনেক সময় দেখা যায়, ক্লান্তির শেষে টংঘরের আঙিনায় রাত অবধি বাঙ্গালী পড়ুয়াকে দিয়ে দেব মুল্লুক সামারোখ, বেহুলা-লক্ষীন্দর, লাইলী-মজনু, ভাওয়াল সন্ন্যাসী, চন্ডীদাস-রজকিনী কিংবা রামায়ন, মহাভারত ইত্যাদি কাব্য কাহিনী শোনার আসর বসাতে।

পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ীদের সাথে সমতল বাসীদের যোগাযোগ ছিলো কয়েক শত বছর আগে। এই শত শত বছর যোগাযোগের মধ্যে পাহাড়ীর জন জীবনে আর্থিক ও সামাজিক উন্নয়ন বা শিক্ষার কোন উন্মোচন হয়নি। এতে বরং মিথ্যা, চুরি, ব্যভিচারী ও বর্বরতার শিকার হয়েছিলো পাহাড়ীরা। এভাবে শত শত বছর শোষিত শাসনের ফলে পাহাড়ীদের মধ্যে কিছু অনুশীলন ঘটে উঁচু নিচু জাতি ভেদাভেদ আর প্রতাপশালীদের দাপট।

অনন্যদৃষ্টিতে তঞ্চঙ্গ্যা জাতি

পার্বত্য চট্টগ্রামের সর্ব প্রথম 'চাকমা জাতির ইতিহাস' লিখেছিলেন রাঙামাটি সরকারী উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষক শ্রী সতীশচন্দ্র ঘোষ (১৮৮৮-১৯২৯ ইং)। তিনি ১৯০৯ সালে চাকমা জাতির ইতিহাস লিখে বাধা প্রাপ্ত হন এবং রাত্রে তাঁর বাস গৃহ অগ্নি সংযোগ করা হয়েছিলো বলে জানা যায়। পরে বিভিন্ন উপকরণ দিয়ে পরিবর্দ্ধিত করা হলে উক্ত সনে পুনরায় ছাপা হয় এবং সেটি একটি গৌরবময় দলিল হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করে।

চাকমা রাজা ভুবন মোহন রায় ১৮ই অক্টোবর ১৯১৯ ইং সনে 'চাকমা রাজ বংশ ইতিহাস' পুস্তিকা প্রকাশিত করেন। পুস্তিকাটি সতীশ চন্দ্রের চাকমা জাতির ইতিহাসকে অনুসরণ করে চাকমা রাজবংশ উৎপত্তি সম্পর্কে বর্ণিত ছিলো।

১৯৪০ সালে 'শ্রী শ্রী রাজনামা বা চাকমার ইতিহাস' প্রকাশিত করেন চাকমা মাধবচন্দ্র কর্মী। তাঁর পুস্তকের উদ্ধৃতি মতে, ব্রহ্মা, সূর্য, মরিচী, কাশ্যপমুনি, হরিশ্চন্দ্র, রাম, ইক্ষাক্কু থেকে উৎপত্তি চাকমা জাতির রাজবংশ এবং বর্তমান রাজা পর্যন্ত লক্ষ বছরের তালিকা বর্ণিত করেছিলেন।

পূর্ববর্তী ইতিহাসকে অস্বীকৃতি প্রদান করে ১৯৬৯ ইং বাবু বিরাজ মোহন দেওয়ান কর্তৃক 'চাকমা জাতির ইতিহাস' নামে তথ্য বহুল একটি পুস্তক নিজ প্রেস থেকে মুদ্রন করেন। পুস্তক প্রকাশিত হয়ে গেলে বাংলা একাডেমী পুরস্কার প্রদান করে থাকে।

এরপর চাকমা জাতি ও স্ববংশ পরিচিতি দিয়ে বাবু নোয়ারাম চাকমা (?) এবং বাবু প্রাণ হরি তালুকদার (১৯৮০) চাকমা ইতিহাস পুস্তিকা প্রণয়ন করেন।

জুন ১৯৮৪, সেপ্টেম্বর ১৯৯৫ ইং "উপজাতিয় গবেষণা পত্রিকা" নামে দুটি পুস্তক প্রকাশিত হয় উপজাতীয় সাংস্কৃতিক ইনষ্টিটিউট রাঙামাটি থেকে। ইহা ছাড়াও চাকমা জাতি সম্পর্কিত ইতিহাস ও ঐতিহ্য নিয়ে কয়েকটি সংকলনও প্রকাশিত হয়েছিলো। ওসব পুস্তকের মধ্যে চাকমা জাতির গোঝা বা গোত্রের সংখ্যা যথেষ্ট ব্যবধান পরিলক্ষিত হয়। এ ব্যাপারে লেখক শ্রী যামিনী রঞ্জন চাকমা মহোদয় চাকমাদের ৪৬ টি গোঝার নাম বর্ণিত করেছিলেন।

আশ্চর্যের বিষয়, গবেষণায় শেষ সিদ্ধান্ত মতে, চাকমাদের মোট ৪৬ টি গোঝা বা গোত্র দেখানো হয়ে থাকলেও এর মধ্যে তঞ্চঙ্গ্যাগণের মোট ৭ টি গছা বা গোত্রের নামের সেখানে কোন মিল বা তুলনা খুঁজে পাওয়া যায় না। এমন কি চাকমা ইতিহাসের

পাতায় তঞ্চঙ্গ্যা নামের কোন শব্দের লাইন একেবারেই নেই বললেই চলে। অথচ শোনা যায় তঞ্চঙ্গ্যাগণই আসল চাকমা। চাকমা ও তঞ্চঙ্গ্যা যদি অভিন্ন বা একই হয়ে থাকে তাহলে এ জাতির মোট ৫৩ টি গোত্র লিপিবদ্ধ থাকা উচিত ছিলো।

ইদানীন্তন রাঙামাটির কোন এক সাময়িকীকে উদ্ধৃত করা হয়েছিলো চাকমা জাতি থেকে অপভ্রংশ বা চাকমা জাতির গোঝা থেকে রূপান্তরিত তঞ্চঙ্গ্যা গছা। যেমন ঃ-

টোন্যা গোঝা থেকে = তঞ্চঙ্গ্যা গছা
ধামেই গোঝা থেকে = ধৈন্যা গছা
মুলিমা গোঝা থেকে = মুগছা
কাম্বেই গোঝা থেকে = কারবুয়া গছা
লার্মা গোঝা থেকে = ল্লাং গছা
আঙ্গু গোঝা থেকে = অঙ্গ্য গছা
(?) গোঝা থেকে = মগলা গছা

এই যুক্তিটি সম্পূর্ণ ভ্রান্ত ধারণা। চাকমা ও তঞ্চঙ্গ্যা অতীতে একই ভাষাভাষী, একই সম্প্রদায় একথা অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু নামের আদ্যাক্ষর মিল রেখে গোঝা থেকে গোঝা উৎপত্তি এমন বর্ণনা ইতিপূর্বে কোন গবেষক বা লেখক তা করেন নি। বিষয়টি সম্পূর্ণ কাল্পনিক।

বিখ্যাত 'আরন্য জনপদে' লেখক জনাব আব্দুস সাত্তার সাহেব তাঁর এই পুস্তক লেখার আগে রাঙামাটিতে দিন কয়েক কাটিয়েছিলেন। তিনি তঞ্চঙ্গ্যাদের সাথে আলাপ না করে ভিন্ন জাতির কাছে শোনা কথাই লিখেছিলেন, 'তঞ্চঙ্গ্যাগণ নিষ্ঠুর। তাদের অভিবাদন শব্দটি নেই, তাই বয়সের জ্যেষ্ঠ ব্যক্তিকে সম্মান দেয় না।' তিনি তার পুস্তকে আরও ব্যক্ত করেছেন, 'চাকমাগণ তঞ্চঙ্গ্যাগণকে ঘৃণার চোখে দেখে আসছে।'

তঞ্চঙ্গ্যাদের মধ্যে কক্সবাজার জেলাধীনে যারা বসবাস করেছে তাদের মধ্যে অধিকাংশ লোকেরাই নামের শেষে চাকমা উল্লেখ করে থাকে। তাদের পূর্ব পুরুষরা এই চাকমা শব্দটি নিজস্ব জাতির পরিচিতি মনে করে। রাঙামাটি জেলায়ও কিছু সংখ্যক তঞ্চঙ্গ্যা তাদের নিজস্ব ভাষায় কথা না বলে চাকমা ভাষায় কথা বলতে বাহাদুরী মনে করে থাকে এবং ওরা নামের শেষে চাকমা পদবী দিয়ে আসছে। এর প্রতিবাদে এডভোকেট জ্ঞানেন্দু বিকাশ চাকমা 'সাপ্তাহিক পার্বতী, ৩০ আগষ্ট-৫ সেপ্টেম্বর ১৯৯১ ইং' সহ আরও কয়েকটি সরকারী অর্থে প্রকাশিত স্মরণিকায় বিভ্রাট বলে জানিয়েছেন, "তঞ্চঙ্গ্যাগণ শিক্ষায় অনগ্রসর, এরা নিজেদেরকে চাকমা দাবী জানিয়ে গর্ববোধ করে আসছে, নিজেদের অস্তিত্ব খুঁজে না পেয়ে ... ...।"

যে জাতি শিল্পে সংস্কৃতিতে উন্নত নয়, সে জাতি শিক্ষায় ও উন্নত নয়, সে জাতি বর্বর। পার্বত্য জেলার সকল পাহাড়ী জাতি তাদের নিজস্ব শিল্প সংস্কৃতিকে পুনরুজ্জীবিত করার উদ্দেশ্যে সরকার বহু লক্ষ টাকা ব্যয়ে ১৯৭৭ ইং সনে রাঙামাটিতে প্রতিষ্ঠা

করেন 'উপজাতীয় সাংস্কৃতিক ইনষ্টিটিউট'। পরবর্তীতে বান্দরবান, খাগড়াছড়ী ও কক্সবাজারে গড়ে ওঠে এ ধরনের ইনষ্টিটিউট এবং এতে কোটি কোটি টাকা ব্যয় করা হচ্ছে কর্মচারীর বেতন ভাতা, প্রশিক্ষণ, সংগ্রহ, প্রকাশনা ও অনুষ্ঠানের নামে। উক্ত ইনষ্টিটিউটে তঞ্চঙ্গ্যা নামে কোন ব্যক্তি চাকুরীতে নিযুক্ত করা হয়নি।

পার্বত্য চট্টগ্রামের দীর্ঘদিনের রাজনৈতিক সমস্যা নিরসনে এরশাদ সরকার কর্তৃক ১৯৮৯ সনের ২৫ শে জুন রাঙামাটি বান্দরবান ও খাগড়াছড়ী এই তিন জেলায় তিনটি স্থানীয় সরকার পরিষদ (বর্তমানে পার্বত্য জেলা পরিষদ) গঠন করেন। স্বায়ত্ব শাসিত পূর্ণাঙ্গ এ পরিষদ বিভিন্ন খাতে প্রতি বৎসর কোটি কোটি টাকা ব্যয় করে থাকে। আশ্চর্যের বিষয়, উক্ত তিনটি পরিষদে কোন তঞ্চঙ্গ্যাকে চাকুরীতে নিয়োগ করা হয়নি।

উপজাতীয় সাংস্কৃতিক ইনষ্টিটিউট রাঙামাটি কর্তৃক ১৯৯৫ ইং সনে 'পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রকৃতি ও সংস্কৃতি' নামে মূল্যবান একটি পুস্তক প্রকাশ করে। পুস্তকটির পাণ্ডুলিপি লিখেছিলেন উপজাতীয় সাংস্কৃতিক ইনষ্টিটিউট এর পরিচালক বাবু সুরেন্দ্র লাল ত্রিপুরা। তিনি অবসর গ্রহণের সাথে সাথে স্মৃতিশক্তি ও বাকশক্তি একেবারেই হ্রাস পেয়ে যায়। এ সুযোগে প্রকাশিত হয়ে থাকে পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রকৃতি ও সংস্কৃতি নামক পুস্তকটি। পুস্তকটি প্রকাশিত হবার সাথে সাথে মহা আড়ম্বরে প্রকাশনা উৎসব করা। পুস্তকটি উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের অনুমোদনে অর্থ বরাদ্দ এবং সম্পূর্ণ সরকারী দায়িত্বে ছাপা হয়েছিলো। এটা একটি ডকুমেন্ট হিসাবে গবেষক, লেখক ও বুদ্ধিজীবিরা ভূমিকা পড়লে রহস্য উদ্ঘাটন করতে পারবেন।

পুস্তকের ভূমিকায় উল্লেখ করা হয়েছিলো- চাকমা, মারমা, ত্রিপুরা, তঞ্চঙ্গ্যা, ম্রো, লুসাই, বম, পাংখুয়া, খুমী, খ্যাং ও চাক এই ১১টি জাতির ইতিবৃত্ত নিয়ে পুস্তকটি লিখা হয়েছে। কিন্তু ভেতরের পাতায় দেখা যায় তঞ্চঙ্গ্যা জাতি সম্পর্কে কোন অধ্যায় ছিলো না ও কোন কিছুই ছাপা নেই, সম্পূর্ণভাবে বাদ দেয়া হয়েছে। শুধুমাত্র দশটি জাতির সম্পর্কে লিখা হয়েছে এবং সেসব জাতির বিভিন্ন চিত্রসহ পুস্তকে স্থান দেয়া হয়। একটি জাতির স্বত্ত্বাকে বিলুপ্ত করার অপপ্রয়াসের জন্য ২৯/৪/'৯৫ ইং বাবু বীর কুমার তঞ্চঙ্গ্যা ও ৩০/৮/'৯৫ ইং বাবু অনিল চন্দ্র তঞ্চঙ্গ্যা পৃথক পৃথকভাবে সমস্ত তঞ্চঙ্গ্যা জাতির পক্ষে অভিযোগ প্রদান করেন। এই অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে বাবু সুগত চাকমা, ভারপ্রাপ্ত পরিচালক, পুস্তকে তঞ্চঙ্গ্যা অধ্যায় ইচ্ছাকৃত ভাবে বাদ দেয়ার সত্যতা স্বীকার করেন এবং বিষয়টি অত্যন্ত দুঃখের বলে তিনি অফিসিয়ালভাবে স্বাক্ষরযুক্ত চিঠি প্রেরণ করেন। চিঠির স্মারক নং-সি/৯৫-৯৬/১১০(২)উসাই, তাং- ২৮/০৯/ ১৯৯৬ ইং।

১৯৮৩ ইং **'তঞ্চঙ্গ্যা সমাজ কল্যাণ সংস্থা'** (তসস) নামে একটি সংস্থা জন্ম নেয়। তঞ্চঙ্গ্যা জাতিকে সংগঠিত করার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন তঞ্চঙ্গ্যা এলাকায় শাখা গঠন করে তাতে শিক্ষা সংস্কৃতি উন্নয়ন করাই এই সংস্থার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য। এই সংস্থার প্রধান কর্মাধ্যক্ষ ছিলেন শ্রী বিধু ভূষণ তঞ্চঙ্গ্যা। বহু ত্যাগ তিতিক্ষার মধ্যে তিনি সংস্থাকে দুই বৎসরাধিক টিকিয়ে রাখতে সক্ষম হয়েছিলেন। পরপর দু'বছর যাবৎ জনসভা করেছিলেন এবং তঞ্চঙ্গ্যা শিল্পী নির্মাণ করে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করেছিলেন একাধিকবার। সংস্থার স্বার্থে তঞ্চঙ্গ্যাদের গ্রামে গ্রামে গিয়েছিলেন সাহায্যের হাত বাড়াতে। এসব কাজে একবার তাঁকে চরম ভাবে অপদস্থ হতে হয়েছিলো সেনাবাহিনীর হাতে। সুতরাং স্বজাতির কাছে সহযোগিতার অভাব ও ইচ্ছার অভাবে সংস্থা নিষ্প্রাণ হয়ে পড়ে। বলাবাহুল্য ইহাই তঞ্চঙ্গ্যাদের প্রথম সংগঠন বলা যেতে পারে।

১৯৯৫ ইং ওয়াগ্গা জুনিয়র হাই স্কুল মাঠে তঞ্চঙ্গ্যা নেতৃবৃন্দের এক জরুরী সভা আয়োজন করা হয়। বান্দরবান ও রাঙামাটি জেলার বিভিন্ন এলাকার তঞ্চঙ্গ্যা নেতৃবৃন্দ এতে উপস্থিত ছিলেন। সভায় তঞ্চঙ্গ্যা জাতিস্বত্ত্বা রক্ষার উদ্দেশ্যে একটি শক্তিশালী কমিটি গঠন করার প্রস্তাব ও তঞ্চঙ্গ্যা সমাজ কল্যাণ সংস্থা (তসস) এর নাম পরিবর্তন করে পুনরুজ্জীবিত করণ বিষয়ে ঐক্যমত পোষণ করা হয়। সভায় সর্ব সম্মতিক্রমে পরবর্তী সভা বালাঘাটায় করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। বালাঘাটায় আহুত নেতৃবৃন্দের সর্বসম্মতিক্রমে 'মহাসম্মেলন' করার প্রস্তুতি গ্রহণে শেষ সভা হয়ে থাকে রাঙামাটি সদরে।

৮ই এপ্রিল ১৯৯৫ ইং বান্দরবান সদর থানাধীন বালাঘাটা হাই স্কুল ময়দানে অনুষ্ঠিত হয় এক অভূতপূর্ব ও ঐতিহাসিক তঞ্চঙ্গ্যা জাতির মহাসম্মেলন। অকৃপণ ভাব বিনিময়ের মাধ্যমে প্রায় পাঁচ সহস্রাধিক তঞ্চঙ্গ্যা সেদিন অঙ্গীকারাবদ্ধ হয় ঐক্যতা ও শান্তির মন্ত্রে। বান্দরবান রাঙামাটি ও কক্সবাজার জেলা থেকে আগত সকলেই নিজস্ব পোষাকে সজ্জিত। ভ্রাতৃত্বপূর্ণ সৌহার্দ্য বন্ধনে সকাল থেকে পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে সাত গছা তঞ্চঙ্গ্যা জাতির মিলন ক্ষেত্র বালাঘাটা ময়দান। ফেলে আসা শত শত বছরের প্রবাস জীবনের ঘটনা প্রবাহ নিরবে ক্ষয় প্রাপ্ত হয় এ জাতির। তারা এক জাতি, তারা অভিন্ন এবং একই পরিবারের সদস্য। আবার শত শত বছর পরে একত্রিত হয়ে স্মরণ করিয়ে দেয় স্মৃতি বিজরিত সেসব ঘটনা প্রবাহ। সেদিন আনন্দ অশ্রু ভার চোখের আর হর্ষ

ধ্বনিতে চৌদিক বিস্তৃত হয় তঞ্চঙ্গ্যা জাতির ভাষা ও সংস্কৃতি। এই জন সভায় সর্ব সম্মতিক্রমে নাম দেয়া হলো **'বাংলাদেশ তঞ্চঙ্গ্যা কল্যাণ সংস্থা'**।

সংস্থার কর্ম তৎপরতা ধীর গতিতে অগ্রসর হতে শুরু করে কর্মীদের সোৎসাহে। বাংলাদেশ তঞ্চঙ্গ্যঅ কল্যাণ সংস্থা করার বিরোধিতায় এবং সংস্থা না করার জন্য উক্ত সময়ের তথাকথিত শান্তি বাহিনীর সদস্যরা তঞ্চঙ্গ্যা জাতির উপর হুমকী দেয় ও কিছু সংখ্যক ধরে নিয়ে যায়। উক্ত সময়ে **"তঞ্চঙ্গ্যা পরিচিতি"** নামে একটি পুস্তক প্রকাশনার কারণে শান্তিবাহিনীরা সীমান্ত পাড়ের বিলাইছড়ি, জুরছড়ি ও বরকল থানার বসবাসরত তঞ্চঙ্গ্যাদের ঘরে ঘরে তল্লাসী চালায়। বহু ঘর-বাড়ি পুড়িয়ে দেয়, মারধর করে এবং তাদেরকে ভারতে চলে যেতে বাধ্য করে।

১৯ শে মার্চ ১৯৯৬ ইং বাবু প্রসন্ন কান্তি তঞ্চঙ্গ্যাকে বান্দরবানের নিজ বাড়ী থেকে ডেকে নিয়ে রাত্রে গুলি করে। তিনি মরেননি, চিরতরে জীবন্মৃত।

তঞ্চঙ্গ্যা জাতির ইতিহাস, ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি বিষয়ক আরও অধিক বই পেতে আমাদের মেইল করুন ঃ chandrasen2014@gmail.com এই ঠিকানায়।

স্মারকলিপি প্রদান

জনসংহতি কর্তৃক পেশকৃত পাঁচদফা দাবী নামায় তৃতীয় পৃষ্ঠায় বর্ণিত ২(ক) ধারায় এগারোটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতির সাংবিধানিক স্বীকৃতির যে প্রস্তাব রাখা হয় তাতে একমাত্র তঞ্চঙ্গ্যা জাতিকে বাদ দিয়ে শুধুমাত্র চাকমা, মারমা, ত্রিপুরা, মুরুং, বোম, লুসাই, পাংখো, খুমী, খিয়াং ও চাক এই দশ জাতির নাম উল্লেখ করা হয়েছিল।

২৫ শে জানুয়ারী ১৯৯৭ ইং প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সাথে জনসংহতি সমিতি (শান্তিবাহিনী)-এর কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দের ঢাকা সংসদ ভবনে সংশোধিত পাঁচ দফা দাবীর প্রেক্ষিতে শান্তির বৈঠকের তারিখ ঘোষণা করা হয়। অবশ্য এর আগেও কয়েকবার খাগড়াছড়িতে তাদের বৈঠক হয়েছিলো। বৈঠকে সরকার ও জনসংহতির মধ্যে আলোচনা ফলপ্রসূ দেখা দেয়। ফলে সংখ্যা লঘুদের সমস্যা এসে দাঁড়ায় তাদের জাতির অস্তিত্ব রক্ষায়।

বাংলাদেশে সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের নির্দেশ মোতাবেক ঢাকা রাজশাহী ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজনীতি বিভাগের প্রফেসর এবং সরকারের উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন লোক রাঙ্গামাটিতে আগমন করেছিলেন। তারা সংখ্যালঘু পাহাড়ী সম্প্রদায়ের মধ্যে শুধুমাত্র রতিকান্ত তঞ্চঙ্গ্যার সাথে দীর্ঘক্ষণ আলাপ করেছিলেন। এ ছাড়াও Prime Minister's Office Armed Forces Division এর Brigadier A. N. Amin, Director Operations & Plans রাঙ্গামাটিতে এসে একই বিষয়ে আলাপ করেন। বিষয়টি হচ্ছে জনসংহতি সমিতির সাথে সরকারের শান্তিচুক্তির ফলপ্রসূ হবার পর আঞ্চলিক পরিষদ গঠন হবে। এতে তঞ্চঙ্গ্যা জাতির জন্য আলাদা আসন সংরক্ষণের দাবীর প্রস্তাব এবং এই প্রস্তাব বাস্তবায়নের আশ্বাস।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক সংসদীয় কমিটি ও পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির নিকট তঞ্চঙ্গ্যা জনগণের পক্ষ থেকে স্মারকলিপি প্রদান করা হয়। ও সময় ঢাকা সংসদ ভবনে ৮ জন এবং খাগড়াছড়ি জেলার পানছড়ি থানাধীন দুদুকছড়া গ্রাম জনসংহতি কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দের নিকট তিন জন সাক্ষাৎ করে স্মারকলিপি পেশ করা হয়।

তঞ্চঙ্গ্যা জাতিকে আলাদা জাতি হিসাবে সাংবিধানিক স্বীকৃতির দাবীতে জনসংহতি সমিতির সর্বাধিনায়কের নিকট যে স্মারক লিপি পেশ করা হয়েছিলো তা এরূপ ঃ-

তঞ্চঙ্গ্যা জাতিকে আলাদা জাতি হিসেবে সাংবিধানিক স্বীকৃতির দাবীতে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক সংসদীয় কমিটি ও পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির নিকট তঞ্চঙ্গ্যা জনগণের পক্ষ থেকে

স্মারকলিপি

বাংলাদেশের দক্ষিণ পূর্বাঞ্চল নদী গিরিবেষ্টিত সবুজ শ্যামলিমায় পূর্ণ পার্বত্য চট্টগ্রাম। এই পার্বত্য চট্টগ্রাম শত শত বৎসর ধরে বিভিন্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতির জনগণের সম্প্রীতি ও সহাবস্থানের ভিত্তিতে এক অনন্য গৌরবময় আবাসভূমি। যুগ যুগ ধরে বিভিন্ন শাসকগোষ্ঠীর অবহেলা ও বৈষম্যমূলক দৃষ্টিভঙ্গির কারণে এ পার্বত্যবাসী বাংলাদেশের সমতল ভূমির বৃহৎ জনগোষ্ঠী থেকে বরাবরই অনুন্নত, অবহেলিত ও পশ্চাদপদ থেকে যায়। এসব বিভিন্ন জাতির জনগণ বরাবরই শোষিত, নিষ্পেষিত এবং বৈষম্যমূলক আচরণে তিল তিল করে দগ্ধ হয়ে এসেছে। এভাবে যুগ যুগ ধরে জুম্ম জনগণের মনে পুঞ্জীভূত দুঃখ বেদনা ও হতাশা থেকেই সৃষ্ট পার্বত্য চট্টগ্রামের দীর্ঘদিনের সমস্যা যা বর্তমানে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ও পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির মধ্যে শান্তিপূর্ণভাবে সমাধানের মহতী উদ্যোগে বাংলাদেশ তথা পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাসকারী সকল তঞ্চঙ্গ্যা জনগণ উভয় পক্ষকেই জানাচ্ছে প্রাণঢালা অভিনন্দন।

পার্বত্যবাসীর সামগ্রিক অস্তিত্ব রক্ষার জন্যে সুদীর্ঘ ২৫ বৎসরের সংগ্রামে অপরিসীম দুঃখ দুর্দশা ত্যাগ তিতিক্ষা ও প্রচুর রক্ত ক্ষয়ের পর আজ মহানুভব গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের একান্ত সচিব আন্তরিক সদিচ্ছার কারণে পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যা শান্তিপূর্ণ ও স্থায়ী সমাধানের লক্ষ্যে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি কর্তৃক দাখিলকৃত সংশোধিত পাঁচ দফা দাবীনামা এবং আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের সংক্ষিপ্ত রূপরেখার ভিত্তিতে আলোচনা উভয় পক্ষের গঠনমূলক উদ্যোগ সুদুরপ্রসারী আশার সঞ্চার করেছে।

ইহা ধ্রুব সত্য যে, পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যা বলতে পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাসরত প্রতিটি জাতির সকল জনগণেরই সমস্যা এবং সমস্যা সমাধানের অর্থও হচ্ছে তাদের সামগ্রিক আর্থ-সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও স্বকীয় বৈশিষ্ট্যের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখা ও ক্রমবিকাশের সুষ্ঠু পরিবেশ সংরক্ষণ করা।

কিন্তু আমরা সমগ্র তঞ্চঙ্গ্যা জাতির জনগণ অত্যন্ত পরিতাপ ও ভবিষ্যত ঘোর হতাশার সাথে বিষয়টি উত্থাপন করতে বাধ্য হচ্ছি যে, পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি কর্তৃক মহানুভব গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের নিকট পেশকৃত সর্বশেষ

সংশোধিত পাঁচ দফা দাবীনামা এবং আঞ্চলিক পরিষদ সম্বলিত আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের সংক্ষিপ্ত রূপরেখাতে (প্রদত্ত দাবীনামার ভিত্তিতেই আলোচনা কেন্দ্রীভূত) তৃতীয় পৃষ্ঠার ২(ক) ধারাতে চাকমা, মারমা, ত্রিপুরা, মুরাং, বোম, লুসাই, পাংখো, খুমী, খিয়াং ও চাক এই ভিন্ন ভাষাভাষী ১০ (দশ) টি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতির সাংবিধানিক স্বীকৃতির যে প্রস্তাব পেশ করা হয়েছে তাতে অতীব দুঃখ ও হতাশার সাথে আমরা লক্ষ্য করছি যে, বৃহত্তর পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাসরত বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে জনসংখ্যার দিক থেকে চতুর্থ স্থান অধিকারী তঞ্চঙ্গ্যা জাতিকে উল্লেখিত দাবীনামায় সাংবিধানিক স্বীকৃতির জন্য অন্তর্ভূক্ত করা হয়নি। যার ফলে তঞ্চঙ্গ্যাদের অস্তিত্ব সম্পর্কে সবার কাছে প্রশ্ন জাগে। এর কারণ আমাদের তঞ্চঙ্গ্যা জাতির কাছে যেমনি বোধগম্য হচ্ছে না, তেমনি জাতির ভবিষ্যতে এর অস্তিত্ব বিকাশ ও সামগ্রিক উন্নতির ব্যাপারটি ঘোর অন্ধকারে আচ্ছাদিত হতে যাচ্ছে বলে আমাদের মনে হচ্ছে। (পার্বত্য চট্টগ্রামের বিভিন্ন জাতির মত তঞ্চঙ্গ্যা জাতিকে একটি আলাদা জাতি হিসেবে উল্লেখ না করার কারণ যদি এটাই হয় যে, হালকা জনশ্রুতি নির্ভর তথ্য- তঞ্চঙ্গ্যারাও চাকমাদের একটি শাখা, তাই তাদের আলাদা অস্তিত্বের স্বীকৃতির প্রয়োজন নেই। এ উক্তির প্রেক্ষিতে আমাদের বক্তব্য হচ্ছে এর পেছনে ঐতিহাসিক কোন জোরালো ভিত্তি নেই। বাস্তব সত্য এই যে, তঞ্চঙ্গ্যাদের আলাদা জাতি হিসেবে পরিচিত হবার যথেষ্ট ভিত্তি রয়েছে)। বস্তুত লক্ষ্যনীয় যে, পার্বত্য চট্টগ্রামের সকল জাতির গঠন কাঠামোতে একটি অসাধারণ ও মৌলিক বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, গছা, গোষ্ঠী ও ডেল বা clan, যে গছা, গোষ্ঠী ও ডেলের সংখ্যা ইচ্ছেমাফিক বাড়ানো বা কমানোর কোন অবকাশ নেই।

চাকমা ও তঞ্চঙ্গ্যাদের মধ্যে জাতি পরিচয়ের ক্ষেত্রে স্বর্গীয় মাধবচন্দ্র চাকমা, সতীশ চন্দ্র ঘোষ, প্রাণহরি তালুকদার, বিরাজমোহন দেওয়ান থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত যে সব গবেষক ও ঐতিহাসিকগণ চাকমা জাতির ইতিহাস লিখেছেন, তাঁদের কেউই চাকমা জাতির গছা, গোষ্ঠী ও ডেলের বিবরণে তঞ্চঙ্গ্যাদের গছা, গোষ্ঠী কিংবা ডেলের নাম অন্তর্ভূক্ত করেন নি। এর দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, তঞ্চঙ্গ্যা জাতি চাকমা জাতি থেকে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন আলাদা একটি জাতি। চাকমা জাতির ইতিহাস গ্রন্থসমূহে চাকমাদের গছা-গোষ্ঠীর বিবরণে এ পর্যন্ত ৩৩ (তেত্রিশ) থেকে ৪৬ (ছেচল্লিশ) টি গছার উল্লেখ পাওয়া যায়। (কিন্তু এ যাবত কোন চাকমা কর্তৃক এ সংখ্যা বিবরণ ও তথ্যের উপর কোন আপত্তি বা মতামত উত্থাপিত হয়নি।) অথচ তঞ্চঙ্গ্যাদের মধ্যে বাংলাদেশে বসবাসকারী ৭ (সাত) টি গছার মধ্যে কোন গছার কথায় চাকমা জাতির গছার মধ্যে উল্লেখ নেই। কাজেই তঞ্চঙ্গ্যারাও চাকমাদের একটি শাখা বা আসল চাকমা বলার কোন যৌক্তিকতা খুঁজে পাওয়া যায় না। তদুপরি ভাষা, সংস্কৃতি, ধর্ম ও জীবনযাত্রার দিক থেকে চাকমাদের সাথে তঞ্চঙ্গ্যাদের কিছু কিছু ক্ষেত্রে মিল থাকলেও উল্লেখিত দিক সহ সামাজিক আচার অনুষ্ঠান ও পোষাক আশাকে তঞ্চঙ্গ্যাদের স্বতন্ত্র

বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। কোন জাতিকে আলাদা ভাবে চেনার প্রথম ও প্রধান বিষয় হচ্ছে তাদের ভাষা ও পোশাক এবং বিশেষ করে মহিলাদের পোষাক আশাকে (এ ক্ষেত্রে স্বকীয় পোষাক পরিহিতা একজন তঞ্চঙ্গ্যা রমনীকে পার্বত্য চট্টগ্রামের যে কোন জাতির হাজার জন রমনীর মধ্য থেকেও চট করে চেনা যাবে যে তঞ্চঙ্গ্যা মহিলা বলে)।

সুদূর বৃটিশ আমল থেকে আজ পর্যন্ত দৈনন্দিন সরকারী কাজে ও সরকারী অনুষ্ঠানাদিতে তঞ্চঙ্গ্যাদের কথা লিপিবদ্ধ হয়ে আসছে এবং তঞ্চঙ্গ্যারাও সুদূর কাল থেকে নিজেকে তঞ্চঙ্গ্যা বলে পরিচয় দিয়ে আসছে। কাজেই স্বতন্ত্র জাতি হিসেবে পরিগণিত তঞ্চঙ্গ্যাকে আলাদা জাতি হিসেবে সাংবিধানিক স্বীকৃতি প্রদানে অযৌক্তিকতা থাকতে পারে না। অথচ পাঁচ দফা রূপরেখায় ২(ক) ধারাতে বোম, লুসাই ও পাংখোদের মধ্যে এবং খুমী ও মুরাংদের মধ্যে ভাষা, পোষাক, আচার-আচরণ ও সংস্কৃতিতে এমনকি ইতিহাসের অনেকাংশে মিল থাকা সত্ত্বেও তাদের প্রত্যেককে স্বতন্ত্র জাতি হিসেবে সাংবিধানিক স্বীকৃতি প্রদানের প্রস্তাব করা হয়েছে। তাই উপরোক্ত প্রামান্য বিবরণ সাপেক্ষে তঞ্চঙ্গ্যাকে স্বতন্ত্র জাতি হিসেবে স্বীকার না করার কোন যুক্তি আছে বলে আমরা মনে করি না।

নিম্নলিখিত কারণে তঞ্চঙ্গ্যা একটি স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন জাতি হিসেবে পরিগণিত হয়ে আসছে।

১। পার্বত্য চট্টগ্রামে ভাষা রয়েছে যা অপরাপর সকল জাতির ভাষা থেকে পৃথক।

৫। তঞ্চঙ্গ্যাদের বহমান সাংস্কৃতিক অপরাপর জুম্ম জাতিগুলোর ন্যায় তঞ্চঙ্গ্যা জাতিরও গছা, গোষ্ঠী, ডেল রয়েছে।

২। তঞ্চঙ্গ্যাদের (বিশেষত তঞ্চঙ্গ্যা রমনীদের) অন্যান্য জাতি থেকে স্বতন্ত্র পোষাক পরিচ্ছদ রয়েছে।

৩। তঞ্চঙ্গ্যাদের উৎপত্তি থেকে বর্তমান অবধি একটি সুনির্দিষ্ট ধারাবাহিক ইতিহাস রয়েছে।

৪। তঞ্চঙ্গ্যাদের নিজস্ব
ধারা উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি ঘটছে।

৬। তঞ্চঙ্গ্যা সাহিত্য ভান্ডার ক্রমাগত প্রসারিত হচ্ছে।

৭। দীর্ঘদিন থেকে বাংলাদেশ বেতার ও বাংলাদেশ টেলিভিশনে অন্যান্য জাতির সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের পাশাপাশি তঞ্চঙ্গ্যাদের আলাদা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানও প্রচারিত হয়ে আসছে।

বৃটিশ যুগ হতে তঞ্চঙ্গ্যাকে আলাদা জাতি হিসেবে বিবেচনা করে সরকারী নথিপত্রে তঞ্চঙ্গ্যা জনগণ আলাদাভাবে উল্লেখিত হয়ে আসছে এবং তঞ্চঙ্গ্যাগণ অপরাপর জাতির ন্যায় সরকারী উদ্যোগ ও আত্মপ্রচেষ্টায় নিজেদের অস্তিত্ব স্বতন্ত্রভাবে প্রতিভাত করে

আসছে। উল্লেখ্য যে, বর্তমানে স্থানীয় সরকার পরিষদ ব্যবস্থাপনা চালু করার পূর্বে সদাশয় সরকার কর্তৃক তঞ্চঙ্গ্যা জাতির পৃথক অস্তিত্ব থাকার কারণে অর্ডিন্যান্স জারী করার সময় রাঙ্গামাটি ও বান্দরবান পার্বত্য জেলার স্থানীয় সরকার পরিষদে তঞ্চঙ্গ্যাদের জন্যে যথাক্রমে ২টি ও ১টি করে আসন সংরক্ষিত রাখা হয়েছে। আরো উল্লেখ্য যে, জাতিসংঘ ঘোষিত বিশ্ব আদিবাসী বর্ষ ১৯৯৩ সনে ঢাকায় অনুষ্ঠিত আদিবাসী সম্মেলন কর্তৃকও তঞ্চঙ্গ্যাদের আদিবাসী হিসেবে স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে।

বাংলাদেশের স্বাধীনতার সুদীর্ঘ ২৫ বছর পর যখন স্পষ্টই প্রতীয়মান হচ্ছে যে, পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যা মূলতঃ বাংলাদেশেরই জাতীয় সমস্যা এবং সমগ্র বাংলাদেশের ১২ কোটি মানুষের ভাগ্য ও আশা আকাঙ্খার সাথে পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জনগণের ভাগ্য এবং আশা আকাঙ্খাও নিবিড়ভাবে জড়িত। পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যা যেমন বাংলাদেশকে বিভিন্নভাবে নাড়া দিয়েছে এবং বিপুল ক্ষতির সম্মুখীন করেছে তদ্রুপ পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির বিজ্ঞ নেতৃবৃন্দ ও সদাশয় বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাসরত প্রতিটি স্বতন্ত্র জাতিসমূহের স্বার্থ যথাযথভাবে রক্ষিত না হলে, তা যত ক্ষুদ্রই হোক বা যত বিলম্বেই হোক পরবর্তীতে সমস্যা যে সৃষ্টি হবে না এ কথা একেবারেই উড়িয়ে দেয়া যায় না। সুতরাং পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাসরত অন্যান্য সকল জাতি তথা বাংলাদেশের সমগ্র জনগোষ্ঠরি সাথে ভ্রাতৃপ্রতিম মনোভাব ও সাহায্য সহযোগিতার মাধ্যমে জাতি গঠনে শরীক হবার আশা নিয়ে আমরা তঞ্চঙ্গ্যা জনগণ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক সংসদীয় কমিটি ও পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির নিকট নিম্নোক্ত প্রস্তাবসমূহ তুলে ধরছি (সর্বশেষ সংশোধিত পাঁচ দফ রূপরেখা ও দাবীনামা অনুসারে)।

১। দাবীনামা

২ (ক) ধারায় চাকমা, মারমা, ত্রিপুরা, মুরুং, বোম, পাংখো, লুসাই, খুমী, খিয়াং ও চাক এ ভিন্ন ভাষাভাষী দশটি জাতির সাথে তঞ্চঙ্গ্যা জাতির সাংবিধানিক স্বীকৃতির বিষয়টিও অন্তর্ভূক্ত করা হোক।

২। আঞ্চলিক পরিষদ সম্বলিত আঞ্চলিক স্বায়ত্বশাসনের সংক্ষিপ্ত রূপরেখার ১ খ (২) উপধারায় জনসংখ্যানুপাতে তঞ্চঙ্গ্যাদের জন্য যথাযথ সংখ্যক আসন সংরক্ষণ করা হোক।

আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে, সদাশয় বাংলাদেশ সরকারের সংসদীয় কমিটির বিজ্ঞ সদস্যবৃন্দ এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির বিজ্ঞ নেতৃবৃন্দ পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাসরত স্বতন্ত্র জাতি হিসেবে তঞ্চঙ্গ্যা জাতির সাংবিধানিক স্বীকৃতি প্রদানের মাধ্যমে তঞ্চঙ্গ্যাদেরকেও পার্বত্য চট্টগ্রামের অপরাপর জাতির ন্যায় বাংলাদেশের সর্বাঙ্গীন কল্যাণের স্বার্থে বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর সাথে একাত্ম হবার সুযোগকরে দেবেন।

পরিশেষে, পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার শান্তিপূর্ণ ও স্থায়ী সমাধানের আশাবাদ ব্যক্ত করে উভয় পক্ষকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

তারিখ ঃ বান্দরবান, উষ্ণ অভিনন্দন সহ

১৬/০১/৯৭ ইং বাংলাদেশে বসবাসরত তঞ্চঙ্গ্যা জনগণের পক্ষে

১। বাবু প্রসন্ন কান্তি তঞ্চঙ্গ্যা

সদস্য, বান্দরবান স্থানীয় সরকার পরিষদ ও

সভাপতি, বাংলাদেশ তঞ্চঙ্গ্যা কল্যাণ সংস্থা।

২। বাবু বীর কুমার তঞ্চঙ্গ্যা

উপদেষ্টা, বাংলাদেশ তঞ্চঙ্গ্যা কল্যাণ সংস্থা।

রাঙ্গামাটি সদর এলাকা।

৩। বাবু রতিকান্ত তঞ্চঙ্গ্যা

প্রতিষ্ঠাতা ও অধ্যক্ষ, রাঙামাটি চারুকলা একাডেমী,

উপদেষ্টা, বাংলাদেশ তঞ্চঙ্গ্যা কল্যাণ সংস্থা।

৪। বাবু রূপময় তঞ্চঙ্গ্যা

সদস্য, স্থানীয় সরকার পরিষদ, রাঙ্গামাটি ও

সিনিয়র সহ-সভাপতি, বাংলাদেশ তঞ্চঙ্গ্যা কল্যাণ সংস্থা।

বিলাইছড়ি এলাকা।

৫। বাবু অনিল চন্দ্র তঞ্চঙ্গ্যা

চেয়ারম্যান, ১নং চন্দ্রঘোনা ইউনিয়ন পরিষদ ও

সম্পাদক, বাংলাদেশ তঞ্চঙ্গ্যা কল্যাণ সংস্থা।

ওয়াগ্গা এলাকা।

৬। বাবু কাঞ্চনজয় তঞ্চঙ্গ্যা

চেয়ারম্যান, ৩নং আলেক্ষ্যং ইউনিয়ন পরিষদ, রোয়াংছড়ি ও

কোষাধ্যক্ষ, বাংলাদেশ তঞ্চঙ্গ্যা কল্যাণ সংস্থা।

রোয়াংছড়ি এলাকা।

৭। বাবু সুদত্ত বিকাশ তঞ্চঙ্গ্যা

সাংগঠনিক সম্পাদক, বাংলাদেশ তঞ্চঙ্গ্যা কল্যাণ সংস্থা।

রাজস্থলী এলাকা।

৮। বাবু নির্মল কান্তি তঞ্চঙ্গ্যা

পৌর কমিশনার, বান্দরবান পৌরসভা ও

যুব কল্যাণ সম্পাদক, বাংলাদেশ তঞ্চঙ্গ্যা কল্যাণ সংস্থা।

বালাঘাটা এলাকা, বান্দরবান।

৯। বাবু লগ্ন কুমার তঞ্চঙ্গ্যা

সাহিত্য সম্পাদক, বাংলাদেশ তঞ্চঙ্গ্যা কল্যাণ সংস্থা
রাজস্থলী এলাকা, রাঙ্গামাটি।

১০। বাবু অনিল তঞ্চঙ্গ্যা

প্রধান শিক্ষক, বেক্ষ্যং জুনিয়র হাই স্কুল ও
যুগ্ম সম্পাদক, বাংলাদেশ তঞ্চঙ্গ্যা কল্যাণ সংস্থা।
রোয়াংছড়ি এলাকা, বান্দরবান।

১১। বাবু দয়ারাম তঞ্চঙ্গ্যা

প্রচার সম্পাদক, বাংলাদেশ তঞ্চঙ্গ্যা কল্যাণ সংস্থা।
বারঘোনিয়া এলাকা, চন্দ্রঘোনা।

১২। বাবু মিলন কান্তি তঞ্চঙ্গ্যা (কবিরাজ)

সভাপতি, টি,সি,সি, বান্দরবান সদর ও
সমাজ কল্যাণ সম্পাদক, বাংলাদেশ তঞ্চঙ্গ্যা কল্যাণ সংস্থা।
বালাঘাটা এলাকা, বান্দরবান।

১৩। বাবু জলেক কান্তি তঞ্চঙ্গ্যা

রেইচা এলাকা, বান্দরবান।

১৪। বাবু উচ্চত মনি তঞ্চঙ্গ্যা

সহ-সাহিত্য সম্পাদক, বাংলাদেশ তঞ্চঙ্গ্যা কল্যাণ সংস্থা।
আলীকদম এলাকা, বান্দরবান।

১৫। বাবু অংসুইপ্রু তঞ্চঙ্গ্যা

সহ-প্রচার সম্পাদক, বাংলাদেশ তঞ্চঙ্গ্যা কল্যাণ সংস্থা।
নাইক্ষ্যংছড়ি এলাকা, বান্দরবান।

কৃতিত্ব ও অবদান

পালকধন তঞ্চঙ্গ্যা ঃ

১৯৩৫ সনে চাকমারাজা ভূবন মোহন রায়ের মৃত্যুর পর কুমার নলিনাক্ষ রায় রাজ্যাভিষেক হন এবং শ্রীমৎ প্রিয়রত্ন মহাস্থবিরকে রাজগুরু মর্যাদায় ভূষিত করেন। প্রিয়রত্নের গৃহীর নাম পালকধন। তিনি তঞ্চঙ্গ্যা জাতির কারবুয়া গছার লোক ছিলেন। মায়ের মৃত্যুর পর জনৈক চাকমা তাঁকে লালন পালন করেছিলেন বলে পালকধন নাম রাখা হয়। চট্টগ্রামের কোন একটি ক্যাংঘরের ভিক্ষুর নিকট শ্রমণ হয়ে পড়ালেখা করেছিলেন তিনি। এরপর শ্রীলংকায় ধর্মীয় উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ করেন।

রাজগুরু হিসাবে তাঁর খুবই সম্ভ্রম ছিলো। ও সময় চাকমা সার্কেলের অধিকাংশই লুরী বা লাউরী নামে স্বেচ্ছাচারী ও মিথ্যা দৃষ্টি সম্পন্ন ধর্মীয় পুরোহিতগণ স্বজাতি রাজার ছত্র ছায়ায় পার্বত্য চট্টগ্রামের উত্তরাঞ্চলে পরিব্যাপ্ত ছিলেন। রাজবাড়ীতে কাঁসর ঘন্টার শব্দ, উলুধ্বনি ও শঙ্খধ্বনি শোনা যেতো এবং সনাতনী ধর্মের পূজা পার্বনকে খুবই মর্যাদা সহকারে পালন করা হতো। কেননা রাজ মহিষী বিনীতা ছিলেন হিন্দু রমনী। সুতরাং রাজগুরু প্রিয়রত্ন বৌদ্ধ ধর্ম সম্প্রসারণে অধিক এগিয়ে যেতে পারেন নি বলে জানা যায়। জীবনের শেষ দিনটি কেটে যায় রাজগুরু হিসেবে রাজ বিহারে। ১৯৫৪ইং সনে তিনি মারা যান।

শ্রীমৎ আচার মহাস্থবির ঃ

রাজগুরু প্রিয়রত্ন মহাস্থবিরের মৃত্যুর কয়েক বছর পর শ্রীমৎ আচার মহাস্থবির ১৯৫৫-১৯৫৭ ইং পর্যন্ত রাঙামাটি রাজ বিহারের বিহারাধ্যক্ষ ছিলেন। ১৯২৭ ইং সনে কলিকাতা ধর্মাংকুর বুড্ডিষ্ট টেম্পলে তিন বৎসর ধর্ম শিক্ষা গ্রহণ করেন। এরপর স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করে তিনি পুনর্বার ১৯৩৩ ইং সনে শ্রীলংকা গমন করেন। সেখানে 'আকালে ওয়ার্তে' নামক বিখ্যাত ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে চার বৎসরাধিক ধর্মীয় শিক্ষা লাভ করেন। বলাবাহুল্য পাহাড়ী ভিক্ষুদের মধ্যে সর্ব প্রথম ধর্মীয় শিক্ষায় বিদেশ গমন করেন ভিক্ষু প্রিয়রত্ন এবং ২য় জন ভিক্ষু শ্রীমৎ আচার।

২০০০ ইং সনে তাঁর ভিক্ষুত্বে বর্ষাবাস বা ওয়া লাভ করেন ৬২টি।

ফুলনাথ তঞ্চঙ্গ্যা ঃ

ভিক্ষু অগ্রবংশের গ্রহীর নাম ফুলনাথ তঞ্চঙ্গ্যা। জন্ম ২৩ শে নভেম্বর ১৯২১ ইং, বাংলা ১৩৩১ সালের অগ্রহায়ন মাসে বর্তমান বিলাইছড়ি থানাধীন রাইংখ্যং নদীর পশ্চিম তীরস্থ ১২২ নং কুতুবদিয়া মৌজায়। পিতার নাম রুদ্রসিং মহাজন। বাল্যকাল থেকে তিনি ছিলেন উদার ও সুন্দর চেহারা। কণ্ঠ ছিলো সুমধুর। যাত্রাদলে গান গেয়ে তিনি খুবই প্রশংসিত হন ভূমিষ্ঠ হবার পর তাঁর নাভীর বৃদ্ধি অংশ বাম স্কন্ধে থাকার শোভা, নাসিকার ডানপাশে ও হৃদয়ের উপর বড় দুটি তিল পরিলক্ষিত হয়।

১৯৩১ সালে রাঙ্গুনিয়ার ঘাটচেক বিহারের অধ্যক্ষ পণ্ডিত শ্রীমৎ ধর্মানন্দ মহাস্থবিরের নিকট শ্রমণে দীক্ষা গ্রহণ করে ১৯৩৯ সালে উপসম্পদা বা ভিক্ষু হয়ে নাম রাখা হয় অগ্রবংশ। ১৯৪৭ সালে মেট্রিক পাশ করে চট্টগ্রামের আন্ধারমাণিক বিহারের বিহারাধ্যক্ষ ত্রিপিটক বাগ্মীশ্বর ও সাধক প্রবর শ্রীমৎ আনন্দমিত্র মহাস্থবির (ইনি পরবর্তীতে নিখিল ভারত সংঘরাজ মহাসভার সভাপতি, দিল্লী) এর পূর্ণ সান্নিধ্য লাভ করে অরণ্যাচারী হন। এরপর ধর্মীয় উচ্চ শিক্ষা গ্রহণের জন্য রেঙ্গুন গমন করেন। তিনি রেঙ্গুন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ত্রিপিটকের দর্শন শাস্ত্রে বুৎপত্তি লাভ করেন।

১৯৫৪-৫৬ সাল পর্যন্ত রেঙ্গুনে "ষষ্ঠ বিশ্ব বৌদ্ধ মহাসংগীতি" অনুষ্ঠিত হয়। বুদ্ধের পরিনির্বাণের ইহাই সর্ব শেষ ও ষষ্ঠ বিশ্ব মহাসম্মেলন। তথাগতের ২৫০০ তম জন্ম জয়ন্তী স্মরণে এই মহা সংগীতিতে ত্রিপিটক শাস্ত্র পুনরালোচনা করে সঠিক বুদ্ধ বচনকে পুনঃ সংকলিত করা হয়। বৌদ্ধ শাস্ত্রে পারংগম বিশ্ববরেণ্য অগ্রমহাপণ্ডিত দ্বারা এই সংগীতি সুসম্পন্ন হয়। স্বাগতিক দেশ বার্মা, পূর্ব পাকিস্তান (বর্তমান বাংলাদেশ), ভারত, সিংহল, শ্যাম (থাইল্যান্ড), জাপান, চীন, নেপাল, ভূটান, লাওস, কম্বোডিয়া, ভিয়েতনাম, সিকিম, তিব্বত, কোরিয়া, মালয় ইত্যাদি বৌদ্ধ রাষ্ট্র ছাড়াও বিশ্বের ৩১ টি দেশের রাষ্ট্র ও সরকার প্রধান এতে যোগদান করেছিলেন। গৌরবের বিষয়, পার্বত্য চট্টগ্রামের কৃতি সন্তান শ্রীমৎ অগ্রবংশ স্থবির উক্ত ষষ্ঠ বিশ্ব মহাসংগীতিতে অগ্রমহাপণ্ডিতের একজন সংগীতিকারক ছিলেন।

রেঙ্গুনে উচ্চ ডিগ্রী সমাপ্তির পর তিনি পিকিং গমনে সফল হয়ে উঠেন। এদিকে চাকমা রাজা ত্রিদিব রায় রেঙ্গুন দিয়ে অগ্রবংশকে আমন্ত্রণ করে এলেন। ২৬ শে ডিসেম্বর ১৯৫৭ ইং স্বদেশের মাটিতে প্রত্যাগমন করলেন অগ্রবংশ। এক শুভ দিনে হস্তী পৃষ্ঠে উপবেশন পূর্বক অভূতপূর্ব রাজকীয় পূর্ণ মর্যাদায় তাকে রাজগুরু পদে বরণ করা হয়। ২২ বৎসর রাজ পৌরহিত্য জীবনে রাজা ত্রিদিব রায়ের উদার সহানুভূতি, অকৃপণ শ্রদ্ধা

পেয়ে রাজগুরু অগ্রবংশের ধর্ম জাগরণ, প্রচার ও প্রসার দ্রুত সার্থক হয়ে ওঠে। ২৬ শে চৈত্র ১৩৭১ বাংলা তাঁকে মহাস্থবির বরণ উপলক্ষে কমিটি গঠন করা হয়।

১। শ্রীযুক্ত কামিনী মোহন দেওয়ান (ভূতপূর্ব এম, এল, এ)	-	সভাপতি
২। শ্রীযুক্ত তুষ্টমনি চাকমা	-	সহ-সভাপতি
৩। শ্রীযুক্ত শৈলেশ কান্তি বড়ুয়া	-	ঐ
৪। শ্রীযুক্ত সনৎ কুমার বড়ুয়া	-	সম্পাদক
৫। শ্রীযুক্ত চিত্রগুপ্ত চাকমা	-	সহ-সম্পাদক
৬। শ্রীযুক্ত বিরাজ মোহন দেওয়ান	-	কোষাধ্যক্ষ
৭। শ্রীযুক্ত উপেন্দ্র লাল চাকমা	-	সদস্য
৮। শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্র লাল চাকমা	-	ঐ
৯। শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্র লাল বড়ুয়া	-	ঐ
১০। শ্রীযুক্ত নিবারণ চন্দ্র দেওয়ান	-	ঐ
১১। শ্রীযুক্ত অনন্ত কুমার চাকমা	-	ঐ
১২। শ্রীযুক্ত অশ্বিনী কুমার কার্বারী	-	ঐ
১৩। শ্রীযুক্ত প্রফুল্ল কুমার বড়ুয়া	-	ঐ
১৪। শ্রীযুক্ত বঙ্কিম কৃষ্ণ দেওয়ান	-	ঐ
১৫। শ্রীযুক্ত সুকুমার বড়ুয়া	-	ঐ
১৬। শ্রীযুক্ত যামিনী কুমার কার্বারী	-	ঐ

পৃষ্ঠপোষক বৃন্দ

১। মেজর রাজা ত্রিদিব রায়, চাকমা রাজা
২। মং রাজা
৩। বোমাং রাজা
} প্রধান পৃষ্ঠ পোষক

৪। রায় বাহাদুর বিরুপাক্ষ রায়
৫। শ্রীযুক্ত বলভদ্র তালুকদার (অবসর প্রাপ্ত ম্যাজিস্ট্রেট)
৬। শ্রীযুক্ত বিধূভূষণ মুৎসুদ্দী (ডিস্ট্রিক্ট এডুকেশান অফিসার)
৭। শ্রীযুক্ত শশাঙ্ক কুমার দেওয়ান (হেডম্যান)
৮। শ্রীযুক্ত কৃষ্ণমোহন খীসা (মহাজন)
৯। শ্রীযুক্ত পুরঞ্জয় খীসা (অগ্রগতি নেভিগেশান কোম্পানীর সত্ত্বাধিকারী)
১০। শ্রীযুক্ত বিজয় চন্দ্র চাকমা (কন্ট্রাক্টর)

রাজবিহার
রাঙামটি।

২৬ শে চৈত্র, ১৩৭১ বাংলা,
২৫০৮ বুদ্ধাব্দ, ১৯৬৫ খৃষ্টাব্দ।

মহাস্থবির বরণ উপলক্ষে নেপাল ও বার্মা রাষ্ট্রদূতসহ বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। উক্ত সময়ে চাকমা সলিল রায় তাঁর রচিত "বুদ্ধের স্মরণে জাগি" নাটক মঞ্চস্থ করেন। এতে রাজকুমারী সহ রাজপরিবারের সদস্যদের অংশ গ্রহণে নাটকটি খুবই উপভোগ্য হয়েছিলো।

শ্রীমৎ অগ্রবংশ রাঙামাটি আগমনের পূর্বে চাকমা সার্কেলে ভিক্ষু ও বৌদ্ধ বিহার ছিলো অতি কম। তবে ভিক্ষুগণ ছিলেন মগ এবং বিহার গুলো ছিলো অধিকাংশই মগের। তিনি রাজগুরু পদে অধিষ্ঠিত হবার পরবর্তী দুই বৎসরে ৩১টি বিহার সংস্কার ও নির্মাণ হয় বলে জানা যায় এবং চাকমা জাতির শ্রমণ ভিক্ষু দ্রুত বৃদ্ধি পায়।

প্রবীবদের মুখে এখনো শোনা যায়, চাকমা সার্কেলে এক সময় ভিক্ষু দেখলে গ্রামবাসীরা পরিহাস করতো। এমন কি ভিক্ষুর পরিধেয় বস্ত্র খুলে দিয়ে উলঙ্গ নাচতে বাধ্য করতো এবং মাথার তালুতে মদ ঢেলে দিতো বলে জানা যায়। ধর্মীয় ও সামাজিক কর্ম লুরী, ব্রাহ্মণ দিয়ে করা হতো। তীর্থস্থান হিসেবে সীতাকুণ্ড ও মন্দাকিনীতে যেতো। সমাজের এমন বাধা ধরা কুসংস্কার থেকে মুক্তির জন্য অগ্রবংশ শিষ্যসহ স্বর্ধের বাণী প্রচারাভিযানে বেড়িয়ে পড়েন পার্বত্য অঞ্চলে। মিথ্যাদৃষ্টি সম্পন্ন মানুষ ফিরে আসতে শুরু করলো বুদ্ধের স্মরণে। যুগযুগ ধরে ঘুমিয়ে থাকা মানুষেরা দেখতে পেলো বৌদ্ধ ধর্মের কি এক অদ্ভুত জাগরণ। সত্যের মহান আদর্শকে অনুসরণ করে মুক্তির পথ এনে দিলেন অগ্রবংশ। মুরং সম্প্রদায়ের নেতা শ্রীহৃদয় রঞ্জন রোয়াজা নির্মাণ করলেন বৌদ্ধবিহার। চাক, খ্যাং ও ত্রিপুরাদের মধ্যে জন কয়েক অগ্রবংশের নিকট দীক্ষা নিয়ে শুরু করলেন ধর্ম প্রচার। পার্বত্য চট্টগ্রামে দান, শীল, ভাবনার সম্যক পদ্ধতি, বুদ্ধ পূজা, সীবলী পূজা, সংঘ দান, অষ্ট পরিষ্কার দান ও কঠিন চীবর দান সর্ব প্রথম প্রচলন শুরু হলো। বন্দনা বা প্রার্থনা, সূত্র বা গাথার উচ্চারণ এবং তার সুর ছন্দের ধারা প্রবর্তন প্রথম শোনা গেলো। ধর্মসভা, ভিক্ষুর কর্তব্য, গৃহীর কর্তব্য ও সর্বোপরি বৌদ্ধ বিহার স্থাপন এবং সম্প্রসারণ, ভিক্ষু সমিতি, বৌদ্ধ সমিতি, পালি টোল ও কলেজ স্থাপন, ছাত্রাবাস ইত্যাদি একমাত্র রাজগুরু শ্রীমৎ অগ্রবংশ মহাস্থবিরের ত্যাগের অন্যতম মহিমা।

২২ শে ডিসেম্বর ১৯৭৩ ইং তিনদিন ব্যাপী 'নিখিল ভারত বৌদ্ধ মহাসম্মেলন' উপলক্ষে সরকারীভাবে আমন্ত্রণ পেয়ে ভারতের ভূবনেশ্বর যান। উক্ত সম্মেলনে তিনি শেষের দিন সভাপতিত্ব করে পার্বত্য চট্টগ্রামের বৌদ্ধ জনগণের কথা তুলে ধরেন।

১৯৫৮ ইং 'সমবায় বুদ্ধোপাসনা' পুস্তক স্বনামধন্য শ্রীযুক্ত কামিনী দেওয়ানের তিন পুত্রের অর্থানুকুল্যে প্রকাশিত হয়। তাঁর তিন অংকের নাটক পরিণাম, মহাযাত্রী (কাব্য), বিজ্ঞান ও বৌদ্ধ ধর্ম, শ্রামণের কর্তব্য, চাংমা কথায় মঙ্গল সূত্র, দর্শন ও বিদর্শন প্রকাশিত হয়। তাঁর দীর্ঘ দিনের প্রচেষ্টায় 'বুদ্ধের অবদান' তিন খণ্ড পাণ্ডুলিপি

রাজবিহারে থাকার সময় লিখেন। ১৯৭১ ইং সনে রাজা ত্রিদিব রায় পাকিস্তান চলে যান। এই সুযোগে কতিপয় স্বার্থন্বেষী রানী আরতিকে প্রলোভিত করার সুযোগ পায়। অতঃপর ১৯৭৯ ইং সনের নভেম্বর মাসে রাজবিহার ত্যাগ করে কলিকাতায় চলে যান। সেখানে বুদ্ধোপাসনা, বোধিচর্যা এবং ইংরেজিতে The StopmGenoside in CHTs. Bangladesh নামে তিনটি পুস্তক প্রকাশ করেন।

১৯৮২ সনে ১৩ই জুলাই পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ী জনগণের উপর অত্যাচারের প্রতিবাদে অগ্রবংশ কলিকাতায় এক জনসভা আয়োজন করেন এবং প্রধান মন্ত্রী শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধীর সাথে সাক্ষাৎ করতে দলের নেতৃত্ব দেন।

১৯৮৭ ইং সনে জানুয়ারী মাসে নেপালে অনুষ্ঠিত হয় আন্তর্জাতিক বৌদ্ধ সম্মেলন। তিনি বাংলাদেশের জনগণের পক্ষে প্রতিনিধিত্ব করে এবং পার্বত্য চট্টগ্রামের বিরাজমান পরিস্থিতি ও উপজাতীয় জনগণের উপর অমানুষিক নির্যাতন আর মানবাধিকার লঙ্গনের অভিযোগ বিশ্ব জনগণের নিকট তুলে ধরেন। ঃ দেশ (ভারত), ইত্তেফাক (বাংলাদেশ)। ইহা ছাড়াও জেনেভায় গিয়েছিলেন পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যার কথা তুলে ধরতে। থাইল্যাণ্ড, কম্বোডিয়া, লন্ডন, হল্যান্ড, সুইজারল্যান্ড, নেদারল্যান্ড, জার্মানী, ভিয়েতনাম, জাপান প্রভৃতি দেশ ভ্রমণ করেছিলেন।

অগ্রবংশের জীবনে তাঁর ধর্মানুশাসন, জীবনাদর্শ যে অক্ষয় কীর্তি তা সাধারণ ভাষায় বলা যায় না। এমন কি এ প্রজন্মের লোকের কাছে তা রূপকথার মতো মনে হতে পারে। পাণ্ডিত্যে, মহিমায়, সাধনায়, ত্যাগে, ক্ষমায় এবং ধর্ম প্রচার ও প্রসারে যে কৃতকার্যতার পরিচয় দিয়েছিলেন তারও অধিক ৬ষ্ঠ সংগীতিকারক অর্থাৎ বুদ্ধের মৃত্যুর পর ৬ষ্ঠ বিশ্ব বৌদ্ধ মহাসম্মেলন হয়েছিলো তিনিই পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে একমাত্র অংশ গ্রহণকারী হিসাবে গৌরবপূর্ণ পুণ্য অর্জনকারী, মানুষের জীবনে এর চেয়ে কি আর প্রয়োজন হতে পারে।

তিনি রাঙ্গামাটিতে রাজগুরু পদে অধিষ্ঠিত থাকার সময় বিভিন্ন বৌদ্ধ দেশের সাথে যোগসূত্র রেখেছিল তার কিছু চিঠি থেকে বুঝা যায়।

PRIME MINISTER'S OFFICE CEYLON

Colombo 11th March, 1964

Rev. Sir,

Improvement of Buddhism in Chittagong Hill Tracts.

I am directed by the Hon. Prime Minister to acknowledge receipt of your leter dated 21st February, 1964 and to inform you that it has been referred to the Hon. Minister of Education and Cultural Affairs for disposal.

I am Rev. Sir,
Your obedient servant.

Rev. Aggavansa Thera,
President of the Chittagong
Hill Tracts Buddhist Association,
Rangamati Rajvihar, Rajbari

f. Acting Secretary to the
Prime Minister.

Headquarters

WORLD FELLOWSHIP OF BUDDHISTS

41, Phar Athit Street
Bangkok, Thailand.

Cable : World Buddhist Bangkok Telephone : 20311
WFB (41) 264/67 Date 8th May, 1967

Ven. Aggavansa Thero,
President
Chittagong Hill Tracts Buddhist Association,
Raj Vihar Bitan, Rangamati,
Chittagong Hill Tracts, East Pakistan.

Your Venerable,

H.D. H. Princess Poon Posmai Diskul, President of World Fellowship of Buddhists has received and read your letter dated 26th Aprill 1967 with high asleem.

With her advice, we have forwarded to you by seamil the following books for information.

With loving kindness and metta.

Yoursn in the Dhamma.
Aicm Sangkhavnsi
Hon. Generni-Scereinry.

A/S

(1) I copy Report of the 8th General Conference of the World Fellowship of Buddhists, Chiangmai, Thailand 6th-12th November B.C. 2509 (1966)
(2) 5 copies Buddhism the religion of Thailand.
(3) 5 copies an Introduction to the W. F. B.
(4) I copy Monarchical Protection of the Buddhist Church in Siam.
(5) I copy Venue of WFB Eighth General Conference.
(6) I copy WFB News Bulletin, Vol-11F, No.6.

Prof. Dr. II. Bechert and Dr. G. Roth Gocttingen. 7.7.67
Indologisches Seminar
Universitnct Gottingen
Hainbundstr. 21
34 Gottingen
Germany (West)

Reverend Rajguru Shrimat Agrvamsa Mohasthavira,
Respectful Greetings.

This is to inform you that we have reached home well accompanied by your blessings. We both very much enjoyed the atmosphere of sanciticity and quiet contemplation at your Rajbari residence. We feel very greatful that you magnanimously let us have a share in your profound knowledge of the Bauddha Dharma and Samgha.

You have also been good enough to lend us the valuable manuscripts from your library. As soon as we have been able to have them xerocopied at out State Library here they will be duly returned.

We pray for the good health and well-keeping of Yours, Reverend Rajguru, and of your fellow bhikkhus.

Bhagavan help us to maintain peace on earth.

Bowing our head we remain with respectful greetings.

Yours sincerely
H. Bechert
G. Roth

THE FOREGN SERVICE

OF THE

UNITED STATES OF AMERICA

Hong Kong, B.C.C.

October 19, 1907

Venerable Raj Guru Aggra Vansa Mahathera
President
Chittagong Hill Tracts Buddhist Association
Rangamati Sub-Division, Chittagong Hill Tracts District
Rangamati, East Pakistan.

Sir,

Since September 15, I have been hospitalized in Hong Kong with a heart attack and regret that I may not be able to visit or even write to you in the near future.

However, I trust that you are all doing well in your work and will remember to write me.

Wishing you the best.

Respectfully yours in the Dhamma
Richard A. Gard

তঞ্চঙ্গ্যা জাতির ইতিহাস, ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি বিষয়ক আরও অধিক বই পেতে আমাদের মেইল করুন ঃ **chandrasen2014@gmail.com** এই ঠিকানায়।

বিহার দান

সুবলং, বনযোগীছড়া এলাকাস্থ সদ্ধর্ম প্রাণ দায়ক দায়িকাগণ কঠোর ত্যাগ তিতিক্ষার বিনিময়ে নির্মিত মনোরম পরিবেশে সজ্জিত একটি বিহার সহ প্রায় তিন একর ভূমি পবিত্র সংঘক্ষেত্রে বিগত নই ডিসেম্বর ১৯৭৩ ইংরেজিতে বিরাট উৎসব মুখর ধর্ম মেলার মাধ্যমে উৎসর্গ করেন।

ধর্মসভা আরম্ভের পূর্ব মুহূর্তে কুমারী যুথিকা দেওয়ান, কুমারী সুরূপা দেওয়ান, কুমারী নমিতা দেবী চাকমা এবং কুমারী আলতা দেবী চাকমা নিম্নোক্ত গানের অভিনব সুরের মুর্ছনায় মহান অতিথিকে পুষ্পবর্ষণ করতে করতে ভক্তির অঞ্জলি (পুষ্পমাল্য) নিবেদন করেন।

ভক্তি অঞ্জলি গীতি

রচনা ঃ বাবু মনদ মুণি চাকমা
সুর ঃ বাবু স্নেহ কুমার কার্বারী

ধন্য ধন্য অগ্রবংশ তোমার কর্ম হে।
ধন্য তোমার জীবন ধারা-
জ্ঞানের সাধক জ্ঞানের তরে -
সাগর পারি দিলে হে,
শিক্ষার শেষে আপন দেশে
আবার ফিরে এলে হে।
ধন্য তোমার শ্রাবক সংঘ
ধন্য তোমার জাতি হে
ধন্য তোমার পিতা-মাতা
ধন্য তোমার জ্ঞাতি হে।
ধন্য তোমার বৌদ্ধ সমিতি
ভিক্ষু সমিতি ধন্য হে,
বিশ্বের মহান কল্যাণ তরে
বৌধি আলো জ্বালাও হে। ঐ

রাজগুরু শ্রীমৎ অগ্রবংশ মহাস্থবিরের প্রচেষ্টায় এতদ্ অঞ্চলে বৌদ্ধধর্মের পুনঃজাগরণ কি আশ্চর্য্যজনকভাবে সম্পন্ন হয় চাকমা রাজা ব্যারিষ্টার দেবাশীষ রায় তাঁর Buddhist Revival in the Chittagong Hill Tracts শীর্ষক সাম্প্রতিক প্রবন্ধে চিত্তাকর্ষকভাবে সুন্দর বর্ণনা প্রদান করেছেন ঃ Kalindi's reforms had far reaching effects not only the Chakmas but also in the Marmas and the Baruas. Since her time, Buddhist has gradually advanced at the expense of animist and other non Buddhist practices. However, the number of Chakma monks and Monasteries in the Chakma country were still far-smaller that in the case of the Barua and the Marma. The great change in the Buddhist practices of the Chakma came in the 1950's almost exactly a hundred years after Rani Kalindi and Sangharaja Saramedha. In 1958, at the invitation of the Chakma Raja Tridiv Roy, the Venerable Agravamsa Thera (now Mahathera) came to Rangamati to be appointed the Chakma Raj Guru.in 1959, the Parbatya Chattagram Bhikkhu Samity, was established under the Rajgurusnleadership and the number of monasteries. These effects were felt even among the smaller peoples such as Mro and Khyang. The Rajguru remained in Rangamati upto 1976 and the Buddhists of Chittagong Hill Tracts recall the venerable Agravansa's name with much gratitude. This learned Pali schoolar and exponent of the Tripitaka who studied in Burma for more than ten years has left belime a rich legacy. (দ্রষ্টব্য ঃ- বিংশতিতম কঠিন চীবর দান স্মরণিকা ১৯৯৩। রাজবন বিহার, রাজবন, রাঙ্গামাটি। পৃঃ ৪৬, ৪৭) রাজা দেবাশীষ রায় মহোদয়ের এই বক্তব্যে রাজগুরু শ্রীমৎ অগ্রবংশ মহাস্থবিরের অবদানের প্রতি স্বতঃস্ফূর্ত স্বীকৃতি এবং তার প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ পেয়েছে।

রাজকবি পমলাধন তঞ্চঙ্গ্যা ঃ

রাঙ্গামাটি সরকারী বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের প্রাক্তন বাংলা অধ্যাপক ও বিশিষ্ট লেখক শ্রীনন্দলাল শর্মার মতে পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে সর্ব প্রথম বৌদ্ধ ধর্মের পুস্তক প্রকাশ করেন কবিরাজ শ্রী পমলাধন তঞ্চঙ্গ্যা। রাইংখ্যং নদীর তীরবর্তী হাজাছড়ি গ্রামে তার জন্ম হয় আনুমানিক ১৮৯৫ ইং সনে। তাঁর প্রথশ ধর্মীয় কাব্য পুস্তক "ধর্ম্মধ্বজ জাতক" প্রকাশিত হয় ১৯৩১ ইং সনে। এরপর ১৯৪৩ ইং সনের দিকে "সত্য নারায়নের পাঁচালী", এরপর "কর্মফল" প্রকাশিত। পার্বত্য চট্টগ্রামের উত্তরাঞ্চলের লোকদের কাছেও সত্য নারায়নের পাঁচালী অতি প্রসিদ্ধ। তিনি মিশ্রিত তঞ্চঙ্গ্যা ও চাকমা ভাষায় রুত্তি বারমাস, আলস্যা মেলার কবিতা, বিয়াল্লিশর ভাতরাদ্ নামে তিনটি বারমাস ছাড়াও "চান্দোবী বারমাস" নামে মূল পাণ্ডুলিপি লিখেছিলেন বলে তার জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রী তরুণ চন্দ্রের নিকট শোনা গিয়েছে।

কবিরাজ পমলাধনের নিজস্ব হ্যান্ড প্রেস ছিলো। তিনি কাঠের হরফ বা অক্ষর তৈরী করে তাতে চুলোর উপর জমে থাকা ধোঁয়ার আন্নোয়াল (কালি, পাতার রস ও কেরোসিন মিশিয়ে প্রেসের ছাপার কালি তৈরী করেছিলেন বলে জানা যায়। ছাপা অক্ষরে প্রথম "চাংমা লেগা শিক্ষা" পুস্তব বের করেন ১৯৩৮ ইং এর আগে।

চাকমা রাজা ভুবন মোহন রায় "রাজকবি" উপাধিতে ভূষিত করে রাজসভায় তাঁকে সমাসীন করেন। সুচিকিৎসক মঘা শাস্ত্রে অভিজ্ঞ ইনি ভারত ও বার্মার চিকিৎসায় খ্যাতি অর্জন করেছিলেন।

গোবীনাথ তঞ্চঙ্গ্যা ঃ

কবি পমলাধন তঞ্চঙ্গ্যার সমসাময়িক কালে আরও একজন কবির নাম পাওয়া যায়। তার জন্ম ঠিকানা পাওয়া না গেলেও তিনি ধৈন্যা গছার লোক ছিলেন বলে জানা যায়। কবির নাম গোবীনাথ তঞ্চঙ্গ্যা। ক্যাঝুরী বারমাস, মুলি বারমাস, কলিযুগর বারমাস ও দ্বিমুক্যা বারমাস নামে চারটি বারমাস চাংমা বর্ণমালা দিয়ে লিখেছিলেন। তিনি ভাদ্রের নদী, চঞ্চলা হরিণীর সাথে সুন্দরী ক্যাঝুরীর প্রেমের কাহিনী বারমাসী ছন্দে বর্ণিত করেছেন। বনের লতা পাতায় মুলি তৈরী হয়, মুলি থেকে মদ হয়, সেই মদ খেয়ে মাতালামী করে, মনুষ্যত্ব হারায়। আবার স্বর্গের ইন্দ্ররাজা মদকে অমৃত সুরা হিসাবে পান করে অপ্সরা নৃত্য উপভোগ করতেন বলে মুলি বারমাসে বর্ণনা দিয়েছিলেন। সত্য, ত্রেতা ও দ্বাপর যুগে সত্য ছিলো বলে কবি তুলনা দিতে গিয়ে কলিযুগের মানুষ দয়ামায়াহীন,গুরুজনের প্রতি অশ্রদ্ধা,নির্লজ্জ আচরণ ও পাপবৃদ্ধির কথা উল্লেখ করেছেন। দুই সতীনের ঝগড়া, স্বামীর জ্বালা ইত্যাদি রঙ্গরস ফুটিয়ে তুলেছেন দ্বিমুক্যা বারমাসে।

গীংখুলি শ্রেষ্ঠ রাজগিংখুলী জয়চন্দ্র তঞ্চঙ্গ্যা (কানা গীংখুলী) ঃ

অমর এক অন্ধ গীংখুলির কৃতিত্ব কাহিনীর কতা যারা শুনেননি পাহাড়ীদের গীংখুলী সংস্কৃতি সম্পর্কে তাদের ধারণা অতি ক্ষীণ একথা বলা চলে। তিনি পার্বত্য চট্টগ্রামের বহু দুর্গম বন গিরি অতিক্রম করে গীংখুলীর সংস্কৃতিকে উজ্জ্বল আলোকে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন, বহু শ্রোতা তাঁর গীতে মুগ্ধ হয়ে শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিলেন। সরস্বতীর

অকৃপণ কৃপায় তিনি অসাধারণ অনুভূতি শক্তি, স্মৃতি ও মর্মাবধারণ সম্পন্ন সেকাল একাল শ্রেষ্ঠ গীংখুলি হিসেবে সমাদৃত।

রাঙ্গামাটি সদর থানাধীন ১০৮ নং মানিকছড়ি মৌজায় তাঁর বাড়ী। জন্মের পর যখন কৈশোরে পদার্পণ করেন তখন চোখ দুটো চিরদিনের জন্য হারিয়ে ফেলেন। বাঁচার জন্য বেছে নিলেন গীংখুলিদের উবাগীতের চর্চার সাধনা। কথিত আছে- চাকমা রাজা ভুবন মোহন রায় শ্রেষ্ঠ গীংখুলি মনোনীত করে পুরষ্কৃত করার উদ্দেশ্যে একদিন বিভিন্ন এলাকার গীংখুলিদের আমন্ত্রণ জানিয়ে জিদ্‌বাদ অর্থাৎ প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছিলেন। উক্ত সময়ে চাকমা সম্প্রদায়ের মধ্যে শ্রী কান্দ্রা গীংখুলির খ্যাতি ছিলো চতুর্দিকে। গীংখুলি কান্দ্রা চাকমা কবিগানের কবিয়াল হিসাবেও সুপরিচিত। তাঁর নিজস্ব গানের দল ছিলো। সেই দলে মহিলা নর্তকী ও বাদ্য বাদক দ্বারা পাহাড় অঞ্চলে নাচ গান করতেন। যাইহোক রাজার আমন্ত্রণ পেয়ে নির্দিষ্ট দিনে গীত প্রতিযোগিতায় উপস্থিত হন এবং জয়চন্দ্র ওরয়ে কানা গীংখুলিকে দেখতে পান। রাজাকে অভিবাদন পূর্বক কান্দ্রা বললেন, "কর্তাবাবু, আমি জয়চন্দ্রের সাথে জিদ্‌বাদে যাবো না, উনি হচ্ছেন আমাদের সবার ওস্তাদ গীংখুলি রাজা।" জয়চন্দ্র গীংখুলি দিন-রাত অনর্গল উবাগীত গাইতে পারতেন। তাঁর গীতের আনন্দ বেদনা ও ভাবস্পর্শী সুর ছিলো। বহু শিষ্যদের মধ্যে বাট্যগীংখুলি পরবর্তী কালে জনপ্রিয়তা লাভ করে ছিলেন।

গীতের বায়না পেয়ে জয়চন্দ্র (কানা গীংখুলি) একদিন সীমান্ত পাড়ের দুমদুম্যা ও ঠেগা যাচ্ছিলেন। সাথে ছিলো তার লাঠি ধরার সাহায্যকারী দুর্গাচরণ চাংমা। সে কয়েক বছর ধরে একাজ করে আসছে। জয়চন্দ্র গীত গেয়ে যা পান সে টাকার সিকি ভাগ পায় দুর্গাচরণ। কিন্তু টাকা প্রতি আট আনা না পেয়ে কুমতলব করতে থাকে দুর্গাচরণ।

তাদের দুমদুম্যা যাবার পথে ঐদিন কে বা কারা বড় একটি মৌমাছির মধুবাসা ভেঙ্গে নিয়ে যায়। মধুবাসা হারানোর ফলে সমস্ত মৌমাছি রাগে উড়তে থাকে। যেই না ওখানে পৌঁছালো তখন দুর্গাচরণ মৌমাছিদের দিকে ঝরা ঢিল ছুঁড়লো। সাথে সাথে ঝাঁপিয়ে পড়লো তাদের উপর। হুল ফুটার আক্রমণ সহ্য করতে না পেরে মরি বাঁচি হয়ে দৌড় দিয়ে ছড়ায় নেমে কুমে ডুব দিয়ে প্রাণ রক্ষা করার চেষ্টা চালালো। কিন্তু কতক্ষণ আর ডুব দেয়া যায়। যন্ত্রণায় আহত হলো দুর্গাচরণ। ওদিকে কানা জয়চন্দ্র পালাতে পারলেন না। তিনি উবাগীতের ভাষায় প্রার্থনা জানালেন- "আগাইত্ বাতাইত্ চন্দ্র সূর্য বন বিক্ষ দেবগণ, সাক্ষী আগ মা বসুমুতি, মুই অন্ধ দোইত্ ন গং। রক্ষা গ মে দেবগণ।" অর্থাৎ আকাশ-বাতাস চন্দ্র সূর্য বনবৃক্ষ দেবতা সবাই, সাক্ষী থাকো মা বসুমতি আমি অন্ধ নিরপরাধী রক্ষা করো মোরে দেবতা সকল।আশ্চর্যের ব্যাপার, জয়চন্দ্র অর্থাৎ কানাগীংখুলিকে একটি মৌমাছিও স্পর্শ করতে পারেনি।

রাজ পরিবারের সাথে জয়চন্দ্রের সম্পর্ক অতি পুরনো। একদিন রাজা রসিকতা করে বললেন, বল দেখি গীংখুল্যা, আমি আগে মরবো নাকি তুমি আগে মরবে? একটু ভেবে জয়চন্দ্র উত্তর দিলো- সত্যি বলবো নাকি কর্তাবাবু? রাজা বললেন- সত্যি বলো। উত্তরে কানা বললেন, আপনি জীবিত থাকতে মরবেন, আপনার অস্বাভাবিক মৃত্যু হবে। জয়চন্দ্রের ভবিষ্যত বাণী সত্য হলো মাত্র কয়েক বছর পর। মৃত্যুবরণ করলেন রাজা নলিনাক্ষ রায়। যে মৃত্যু অবাস্তব ও অকাল মৃত্যু।

গীংখুলি শ্রেষ্ঠ জয়চন্দ্র অন্ধ হলেও পরিবার অসচ্ছল ছিলো না তার। চাষের কাজ, গৃহস্থের কাজ, মাছ ধরা, বাজারে বেচা-কেনা এমনকি গরু চড়াতেন এমন তথ্যও পাওয়া যায়। তিনি ভুবন মোহন, নলিনাক্ষ ও ত্রিদিব এই তিন রাজার অতি পরিচিত ছিলেন। রাজা নলিনাক্ষ রায় তাঁকে "রাজগীংখুলি" উপাধি দিয়ে প্রতি বছর রাজপুণ্যাহ উপলক্ষে রাজ সভায় সমাসীন করতেন।

কবিরত্ন কার্ত্তিক চন্দ্র তঞ্চঙ্গ্যা ঃ

অধ্যাপক নন্দলাল শর্মার মতে পার্বত্য চট্টগ্রামে সর্বাধিক বৌদ্ধধর্মের কাব্যগ্রন্থ প্রকাশনা করেছিলেন শ্রীকার্ত্তিক চন্দ্র তঞ্চঙ্গ্যা। রাঙ্গামাটি জেলার বিলাইছড়ি থানাধীন ১২২নং কুতুবদিয়া মৌজায় ১৯২১ ইং সনে তাঁর জন্ম হয়। তিনি কৃষিজীবি হলেও গ্রামের ইউপি স্কুলে কয়েক বৎসর শিক্ষকতা করেন এবং পরবর্তীতে চিকিৎসক হিসাবে পরিচিত হন। তাঁর প্রথম পুস্তক "বৌদ্ধ ধর্ম শিক্ষা" (১৯৪৫) প্রকাশিত হয়। এরপর উদয়নবস্তু বা কর্মফল, মোহবসান, মানুষ-দেবতা নামে তিনটি নাটক এবং কুলধর্ম (কাব্য), রাধামন-ধনপুরী (গীতিনাট্য) লিখেছিলেন। তাঁর উদয়ন বস্তু বা কর্মফল কাব্য পুস্তক প্রকাশনার জন্য রাঙ্গুনীয়া ভিক্ষু সমিতিরি পক্ষ থেকে সভাপতি শ্রীমৎ সুগত বংশ মহাস্থবির কর্তৃক আনুষ্ঠানিক ভাবে "কবিরত্ন" উপাধিতে ভূষিত করেছিলেন। তাঁর বহু কবিতা বিভিন্ন সাময়িকীতে ছাপা হয়েছিলো। স্মরণীয় ও বরণীয় এই কবি ২২শে মার্চ, ১৯৯৭ ইং, ৮ই চৈত্র, ১৪০৩ বাং সকালে পরলোক গমন করেন।

ভিক্ষু শ্রীমৎ ক্ষেমংকর মহাস্থবির ঃ

গৃহীর নাম তালেন্দ্র তঞ্চঙ্গ্যা। কলিকাতা ধর্মাংকুর বুড্ডিস্ট টেম্পলের পণ্ডিত শ্রীমৎ ধর্মাধার মহাস্থবিরের নিকট শ্রমণ হন এবং চার বৎসর ধর্ম শিক্ষা গ্রহণ করেন। ১৯৫১ ইং রেঙ্গুনে পাত্তান ক্যাং নামে একটি প্রসিদ্ধ ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে তিন বৎসর বার্মিজ ভাষা আয়ত্ব করেন এবং অংমালা পালি কলেজে পাঁচ বৎসর অভিধর্ম বিভাগে পড়া লিখা করে উচ্চ ডিগ্রী কৃতিত্বের সাথে সম্পন্ন করেন। ১৯৫১ ইং সনে কর্ণফুলী নদীর কাপ্তাই বাঁধ সম্পন্ন হয়ে গেলে পার্বত্য চট্টগ্রামের চাকমা সার্কেলের অধিকাংশ লোক জায়গা জমি, ঘর পরিজন ফেরে অন্যত্র চলে যেতে থাকে। এ সংবাদ পেয়ে তিনি স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। নীরবকর্মী ক্ষেমংকর মহাস্থবির মাটিকা ধাতু, যমক স্বরূপিনী, ধর্ম সঙ্গিনী, বিভঙ্গ ও জিনাত্তা নামে পাঁচটি পাণ্ডুলিপি তৈরী করেন বার্মিজ গ্রন্থ অনুবাদ করে। তিনি ১৯৯৪ সালে "অভিধর্ম সংগ্রহ স্বরূপিনী" ২০০০ সনে, চলার পথে এবং ১৯৯৯ সনে "সাতিকা ধাতুকথা স্বরূপিনী" নামের তিনটি দর্শন সম্পর্কিত গভীর তথ্যাদি দ্বারা পুস্তক ওয়াগ্গা বৌদ্ধ বিহার থেকে প্রকাশিত করেন।

বিলাইছড়ি থানাধীন শামুকছড়ি গ্রামে ১৯১৮সনে তিনি জন্ম গ্রহণ করেন। ২০০০ সনে তাঁর ভিক্ষু জীবনে বর্ষাবাস বা ওয়া পঁয়তাল্লিশটি।

শ্রী যোগেশ চন্দ্র তঞ্চঙ্গ্যা

সাতটি গছার একটি জাতি। সেই জাতির নাম তঞ্চঙ্গ্যা জাতি। এই তঞ্চঙ্গ্যা জাতির ইতিহাস সর্ব প্রথম লিখে অগ্রগণ্য অবদান রেখেছিলেন শ্রী যোগেশ চন্দ্র তঞ্চঙ্গ্যা। ১৯৮৫ ইং সনে "তঞ্চঙ্গ্যা উপজাতি" নামে তার ইতিহাস প্রকাশিত হয়। তিনি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ছিলেন। ১৯৮৮ইং সনে চাকুরীতে অবসর গ্রহণ করে ১৯৯৩ ইং সনে পরলোক গমন করেন।

কৈশরে তিনি চট্টগ্রামের আর্যসংগীত বিদ্যাপীঠ থেকে তদানিন্তন ওস্তাদ জগদানন্দ বড়ুয়ার নিকট সংগীত ও বাঁশী প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করেন। যাত্রা দলের কয়েকটি নাটকে তিনি নারীর অভিনয় করে প্রশংসা লাভ করেছিলেন। তিনি বিভিন্ন সংকলনে ছোট গল্প ও কবিতা লিখে সুপরিচিত হয়েছিলেন। বিলাইছড়ি থানাধীন ১২২নং কুতুবদিয়া মৌজায় তাঁর জন্ম এবং শ্রী কুঞ্জ মহাজনের পৌত্র ছিলেন।

শ্রী ঈশ্বর চন্দ্র তঞ্চঙ্গ্যা

ইনি তঞ্চঙ্গ্যা সম্প্রদায়ের প্রথম বি.এ. পাশ। ১৯৩৫ ইং সনে রৈস্যাবিলি নামক স্থানে তার জন্ম হয়। জেলা কানুনগো হিসাবে তাঁর চাকুরী জীবনে কয়েকটি গান লিখেছিলেন। ১৯৯৩ ইং সনে ঢাকায় সার্কভুক্ত সাতটি দেশের রাষ্ট্র প্রধান ও প্রতিনিধির উপস্থিতিতে তাঁর "ও সন্দর পুনং চান" গানটির উপর দেড়শতাধিক তরুনী নৃত্য পরিবেশন করে থাকে। ১৯৯৩ ইং সনে রাঙ্গামাটিস্থ নিজ বাড়িতে পরলোক গমন করেন।

শ্রী বীর কুমার তঞ্চঙ্গ্যা

৮ই এপ্রিল ১৯৯৫ সনে বান্দরবান সদর থানাধীন বালাঘাটায় তঞ্চঙ্গ্যা ঐতিহাসিক মহাসম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এতদোপলক্ষে তাঁর **তঞ্চঙ্গ্যা পরিচিতি** নামে পুস্তক প্রকাশিত হয়। ১৯৮১ সনে শ্রীলঙ্কা সরকার কর্তৃক প্রদত্ত একটি বোধিবৃক্ষের চারা বাংলাদেশের শ্রীলঙ্কার রাষ্ট্রদূত রাঙ্গামাটি রাজবন বিহারে আনয়ন করেন। বোধি চারাটি গৌতম যে বট বৃক্ষ মূলে বসে বুদ্ধত্ব লাভ করেন সে বৃক্ষেরই স্বংশজাত। উক্ত সময়ে রাজবন বিহারে এক অভূতপূর্ব মানুষের ঢল বয়ে যায়। শ্রীলঙ্কা ও বার্মার রাষ্ট্রদূত ছাড়াও দেশের সরকার প্রতিনিধি উক্ত বোধিচারা রোপন উৎসবে উপস্থিত ছিলেন। এই মহতী অনুষ্ঠানে "বৃহতের সন্ধানে" নামে স্মরণিকা প্রকাশ করে শ্রী বীর কুমার যশস্বী হন। তাঁর প্রকাশিত পুস্তকের মধ্যে অর্হৎ সীবলী (চাকমা ভাষায়), চাকমাদের সামাজিক অনুষ্ঠান ও বৌদ্ধ ধর্ম, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও ধর্মীয় দর্শন, লোকায়ত দর্শন খুবই উল্লেখযোগ্য ও গবেষণা মূলক রচনা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ বলে স্বীকৃতি পায়। কলিকাতা থেকে নিয়মিত

প্রকাশিত "বোধি ভারতী" পত্রিকায় কয়েকটি গল্প ও প্রবন্ধ ছাপা হয়েছিলো। ঐ পত্রিকায় তাঁর ইংরেজি কবিতা In Quest of Peace শ্রীলঙ্কা ও থাইল্যান্ড থেকে ধর্মীয় সেমিনারে পঠিত হয়েছে বলে জানা যায়। বাবু বীর কুমার একজন বলিষ্ঠ লেখক এবং তাঁর প্রবন্ধের উপর এ যাবৎ কয়েকটি উল্লেখযোগ্য সেমিনার হয়েছিলো।

শ্রী কুঞ্জ তঞ্চঙ্গ্যা

তঞ্চঙ্গ্যা জাতির এক ধনাঢ্য মহিলার নাম কুন্তি দেবী। তাঁর জন্ম তারিখ আনুমানিক ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দের আগের। বর্তমান জুরছড়ি থানাধীন সলক বা সুবলং নদীর উজানে তেছড়ি নামক স্থানে ও সময় তাঁদের গ্রাম ছিলো। ধরিত্রীর কৃপায় সামান্য জুম চাষ করে তিনি পেতেন তার বহুগুণ বেশী শস্য সম্পদ। তাই তাকে এলাকাবাসী সবাই মনে করতো স্বয়ং মালক্ষ্মী। অনেকেই সারা বছরের পরিশ্রমের ফসল যাতে খুশি মনে বাড়িতে তুলতে পারে সেজন্য কুন্তির নামে মানস করতো। তার নাকি ২৫টি স্বর্ণ মুদ্রা ও ১০০০টি রৌপ্য মুদ্রা ছিলো।

কুন্তির একপুত্র দুই কন্যা। পুত্রের নাম কুঞ্জ তঞ্চঙ্গ্যা। যৌবন প্রাপ্তির পর কুঞ্জ মহিষ চড়াতে গিয়ে নির্জন স্থানে এক শান্ত সৌম্য ধীর সন্ন্যাসীর সাক্ষাৎ হয়। সন্ন্যাসী কুঞ্জকে বলেছিলেন- "তোমার মাথার খবং খুলো।" এই বলার পর কপালের রেখার দিকে তাকিয়ে বলেছিলেন- "তুমি বড় লোকের পিতা হবে।"

কুঞ্জ সতেরো বছর বয়সে একটি গণ্ডার শিকার করে ছিলেন বলে জানা যায়। একদিন দূর বনের শিকার করতে গিয়ে দেখতে পেয়েছিলেন প্রকাণ্ড এক বাঘ জংলী ছড়া ধীর গতিতে পাড় হচ্ছে। সাথে সাথে বন্দুক তুলে তাক দিয়ে গুলি ছুঁড়তে উদ্যত হলেন কুঞ্জ। কিন্তু পারলেন না। ওটা বাঘ নয়, বাঘরূপী একজন ফুগির বা সন্ন্যাসী। বন্দুক তাক দিলে দেখতে পান ফুগির। আবার বন্দুক নামিয়ে দেখলে বাঘ! এমন চমকিত অলীক ঘটনা দর্শনে গুলি না ছুঁড়ে বাড়িতে ফিরে এলেন। রাত্রে বাঘরূপী সন্ন্যাসী কুঞ্জকে স্বপ্ন যোগে জানালেন- তুমি এবার থেকে বন্দুক ত্যাগ কর, ভাগ্য তোমার উন্নতি হবে। বাঘরূপী ফুগির যেখানে দর্শন হয়েছিলো এই ঘটনার পর সেই ছড়ার নাম রাখা হয় ফুগির ছড়া। স্মৃতি বিজরিত সুবলং-এ ফুগির ছড়ায় বর্তমানে মানুষের বসতি গড়ে উঠেছে, সেখানে ফুগির ছড়া বাজার ও স্কুল হয়েছে।

১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দের পর সুবলং এলাকা সরকার বনায়ন করার ঘোষণা দিলে লোকজন সে স্থান ত্যাগ করে রাইংখ্যং এলাকায় পুনঃবসতি স্থাপন করে। ১২২নং কুতুবদিয়া মৌজার বড়াদমে সুন্দর একটি দ্বিতল বাড়ি নির্মাণ করে জুমের পরিবর্তে জমি চাষে মনোনিবেশ করেন এবং জমিদার কুঞ্জ মহাজন নামে পার্বত্য চট্টগ্রামে সুপরিচিত হন।

অতি দয়ালু ও অকৃপন দাতা হিসাবে সকল পাহাড়ি জাতির কাছে তিনি অতি শ্রদ্ধেয় ছিলেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় অনাহারে প্রপীড়িত শত শত মানুষের জীবন বাঁচিয়ে ছিলেন তিনি। তাঁর পাঁচ পুত্র রাইংখ্যং এলাকায় শ্রেষ্ঠ মহাজন হিসাবে পরিচিত ছিলেন।

কে কোন বিষয়ে সর্বপ্রথম

১। শ্রেষ্ঠ ধনাঢ্য মহিলা ঃ কুন্তি দেবী (আনুমানিক ১৮০০ সনের আগে) তাঁর ২৫টি স্বর্ণ মুদ্রা ও ১০০০টি রৌপ্য মুদ্রা ছিলো।

২। শেষ্ঠ অর্থশালী ঃ কুন্তি দেবীর একমাত্র পুত্র কুঞ্জ। তাঁর ১। রসিক চন্দ্র। ২। জুরচান। ৩। শিকল চান (এই পুস্তক লেখকের পিতা) ৪। রসিক নাগর। ৫। গুণমণি নামে এই পাঁচ পুত্র সবাই তঞ্চঙ্গ্যা জাতির শ্রেষ্ঠ মহাজন নামে খ্যাত।

৩। শ্রেষ্ঠ বলি ঃ লাল মুনি তঞ্চঙ্গ্যা। বৃটিশ সরকারের দশজন শক্তিশালী সৈনিকের সাথে তিনি একক ভাবে দড়ি টানাটানি প্রতিযোগিতায় জয়ী হয়ে পুরস্কার লাভ করেন। স্বনামধন্য কামিনী মোহন দেওয়ান কর্তৃক রাঙ্গামাটিতে এই আয়োজন করেছিলেন বলে প্রত্যক্ষদর্শীর নিকট জানা যায়।

তঞ্চঙ্গ্যা জাতির আরো একজনের নাম খাইত বলি। তিনি লাল মণির আগে বলি নামে সুপরিচিত ছিলেন। বলি মাত্রেই অলস গরীব ও শান্ত। তাই একদিন জুমের টংঘরে রাখা পরের ধান ১৮ আড়ি (এক আড়ি = ১৬ সের অর্থাৎ ৭ মণ ৮ সের) একাই বড় একটি পুক্যাসহ চুরি করে নিয়ে যান।

৪। সর্বপ্রথম ধর্ম পুস্তক ও চাংমা লেখা ঃ পুস্তক প্রণেতা ঃ শ্রী পমলা ধন তঞ্চঙ্গ্যা। ১৯৩১ সালে ধর্ম্মধ্বজ জাতক, ১৯৩৮ সালে 'চাংমা লেখা' নামে বর্ণমালার পুস্তক প্রকাশ করেন। তিনি রাজকবি উপাধি লাভ করেন।

৫। ধর্মশিক্ষায় বিদেশ গমন ঃ ভিক্ষু প্রিয়রত্ন। গৃহীর নাম পালক ধন তঞ্চঙ্গ্যা। তিনি চাকমারাজ নলিনাক্ষ রায়ের রাজগুরু

		ছিলেন। জীবনে একবার শ্রীলংকা গমন করেছিলেন বলে জানা যায়। তবে তঞ্চঙ্গ্যা ভিক্ষু শ্রীমৎ আচার ১৯৩৩ সনে শ্রীলঙ্কায় আকালে ওয়ার্তে নামক প্রতিষ্ঠানে ধর্মীয় শিক্ষা লাভ করেন।
৬। ধর্মীয় শিক্ষায় বিদেশে উচ্চ ডিগ্রী ও ষষ্ঠ সংগীতি কারক	ঃ	ভিক্ষু অগ্রবংশ। রেঙ্গুনে ১১ বৎসর ধর্মীয় শিক্ষা লাভ করেন। ১৯৫৭ সালে চাকমা রাজা ত্রিদিব রায়ের আমন্ত্রণে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন এবং রাজগুরু পদে অধিষ্ঠিত হন।
৭। প্রথম কঠিন চীবর দান	ঃ	১২০নং ছাক্রাছড়ি মৌজার হেডম্যান শ্রী ভক্কলী আমু কর্তৃক ১৯৪৫ সালে বগলতলী বৌদ্ধ বিহারে কঠিন চীবর দানের আয়োজন করেন। সম্ভবত পার্বত্য চট্টগ্রামে এটায় সর্বপ্রথম।
৮। শ্রেষ্ঠ গিংখুলী	ঃ	শ্রী জয়চন্দ্র তঞ্চঙ্গ্যা (কানা গিংখুলী)। অসাধারণ স্মৃতি শক্তি সম্পন্ন তিন রাজার কাছে অতি প্রিয় এবং রাজ গিংখুলী উপাধিতে ভূষিত হন।
৯। প্রথম ইউ.পি চেয়ারম্যান	ঃ	রেগ্যচু তালুকদার, রাজস্থলী।
১০। প্রথম এন্ট্রান্স পাশ	ঃ	শোভারানী তালুকদার।
১১। প্রথম জিটি পাশ	ঃ	বাল্মিকী প্রসাদ তঞ্চঙ্গ্যা।
১২। প্রথম বি.এ পাশ	ঃ	ঈশ্বর চন্দ্র তঞ্চঙ্গ্যা।
১৩। সর্বাধিক ধর্ম গ্রন্থ প্রণয়ন করন	ঃ	কার্ত্তিক চন্দ্র তঞ্চঙ্গ্যা। ধর্মীয় কাব্য, নাটক, বারমাস ১১টি প্রকাশ করেন। তিনি কবিরত্ন উপাধি পান।
১৪। বি.কম; এল.এল.বি; ই.পি.সি.এস	ঃ	যতীন্দ্র প্রসাদ তঞ্চঙ্গ্যা। তিনি পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতীয়দের মধ্যে সর্বপ্রথম এল.এল.বি. ডিগ্রী অর্জন করেন। চাকুরীর শেষে তিনি চট্টগ্রাম বিভাগের অতিরিক্ত বিভাগীয়

কমিশনার এবং সর্বশেষে আঞ্চলিক পরিষদ পার্বত্য জেলায় মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তার দায়িত্ব পালন করেন।

১৫। প্রথম ইতিহাস প্রণেতা ঃ যোগেশ চন্দ্র তঞ্চঙ্গ্যা। ১৯৮৫ সনে "তঞ্চঙ্গ্যা উপজাতি" প্রকাশিত করেন। চট্টগ্রামের আর্য সংগীত থেকে সংগীত ও বাঁশি প্রশিক্ষণ লাভ করেন ১৯৫২ সনে। নাটকে অভিনয় করে খ্যাতি লাভ করেন। পেশায় শিক্ষক।

১৬। বিশিষ্ট লেখক ঃ বীর কুমার তঞ্চঙ্গ্যা। ১৯৮১ সনে শ্রীলংকা সরকার কর্তৃক রাজবন বিহারে বোধিচারা রোপন উপলক্ষে প্রকাশিত "বৃহতের সন্ধানে" তাঁর কৃতিত্বের অন্যতম অবদান। তিনি একজন ১ম শ্রেণীর লেখক হিসাবে বিভিন্ন সংকলনে তাঁর লেখার উপর ভিত্তি করে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য সেমিনার হয়েছে।

১৭। প্রথম সিনিয়র নার্স ঃ রেণু তালুকদার।

১৮। প্রথম এম,এ ঃ জ্ঞান রঞ্জন তঞ্চঙ্গ্যা।

১৯। প্রথম মহিলা এম,এ ঃ স্নিগ্ধা তঞ্চঙ্গ্যা।

২০। প্রথম এম,এস,এস ঃ মিলন কান্তি তঞ্চঙ্গ্যা।

২১। প্রথম বি,এস,সি ঃ সত্য বিকাশ তঞ্চঙ্গ্যা।

২২। প্রথম মহিলা বি,এস,সি ঃ জ্যোৎস্না তঞ্চঙ্গ্যা।

২৩। প্রথম এল,এল,এম ঃ দীননাথ তঞ্চঙ্গ্যা।

২৪। প্রথম বিএসসি ইঞ্জিনিয়ার ঃ দীপ্তিময় তঞ্চঙ্গ্যা।

২৫। প্রথম বি,এ অনার্স, এম, কম ঃ রাজেন্দ্র তালুকদার।

২৬। প্রথম ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার ঃ নব কুমার তঞ্চঙ্গ্যা।

২৭। প্রথম সূত্র,বিনয়,অভিধর্ম উপাধি ঃ রতিকান্ত তঞ্চঙ্গ্যা।

২৮। মুক্তিযোদ্ধা ঃ অনিল চন্দ্র তঞ্চঙ্গ্যা। তিনি ১৯৭১ সনে ১নং সেক্টরে দায়িত্ব পালন ও সাহসিকতার পরিচয় বহন করেছিলেন।

২৯। বেতার ও টিভি শিল্পী ঃ দীননাথ তঞ্চঙ্গ্যা।

৩০। মহিলা বেতার শিল্পী	ঃ	সুনীলা দেবী তঞ্চঙ্গ্যা।
৩১। এমবিবিএস	ঃ	মিতালী তঞ্চঙ্গ্যা।
৩২।প্রথম সাংস্কৃতিক দল গঠন করেন	ঃ	আদিচন্দ্র তঞ্চঙ্গ্যা।
৩৩। জেলা পরিষদের প্রথম সদস্য	ঃ	১। প্রসন্ন কান্তি তঞ্চঙ্গ্যা। ২। রূপময় তঞ্চঙ্গ্যা। ৩। পরিমল চন্দ্র তালুকদার।
৩৪।আঞ্চলিক পরিষদের প্রথম সদস্য	ঃ	ডাঃ নিলু কুমার তঞ্চঙ্গ্যা।
৩৫। প্রথম পৌর কমিশনার	ঃ	নির্মল কান্তি তঞ্চঙ্গ্যা।
৩৬। চারু ও কারু শিল্পী	ঃ	রতিকান্ত তঞ্চঙ্গ্যা। বৃহত্তর তিন পার্বত্য জেলার সর্ব প্রথম চারু ও কারুকলা বিষয়ে সম্পূর্ণ অবৈতনিক ভাবে প্রশিক্ষণ দিয়ে ১৯৭৯ সালে "রাঙামাটি চারুকলা একাডেমী" নামে একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। সম্পূর্ণ সরকারী বেসরকারী আর্থিক সাহায্য ছাড়াই একক প্রচেষ্ঠায় টিকে রাখা প্রতিষ্ঠানের ছাত্র-ছাত্রীরা এযাবৎ বহু জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পুরস্কার লাভ করে সকল সরকারী সাহায্যপুষ্ঠ প্রতিষ্ঠানের চেয়ে কৃতিত্বে অগ্রগামী রয়েছে। ১৯৯৭ সনের মধ্যে ১৭ জন দেশের ও দেশের বাইরে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ করেছিলো এবং অত্র এলাকাতে প্রদর্শনীর মাধ্যমে চারুকলা ব্যাপক সম্প্রসারণ ঘটেছে। বহু পুস্তকের প্রচ্ছদ, বিভিন্ন সংকলনে মনোগ্রাম ছাড়াও সাজসজ্জার নৈপুন্যতার পথ প্রদর্শক এবং আড়াই শতের মতো বাংলা তঞ্চঙ্গ্যা ও চাকমা গান রচয়িতা। সরকারী কর্মচারী আমিন। তদানিন্তন বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ি শিল্পী হিসাবে ১লা জানুয়ারী ১৯৮১ সনে বঙ্গভবনে তঞ্চঙ্গ্যা শিল্পীকে সম্বর্ধনা প্রদান করেন।

তঞ্চঙ্গ্যাদের মধ্যে উচ্চ শিক্ষা (ডিগ্রী) লাভ

(১৯৯৪ ইং সনের মধ্যে)

১। ঈশ্বর চন্দ্র তঞ্চঙ্গ্যা - বি, এ।
২। যতীন্দ্র প্রসাদ তঞ্চঙ্গ্যা - বি, কম; এল, এল, বি; ই, পি, সি, এস।
৩। শোভারানী তালুকদার - বি, এ।
৪। জ্ঞান রঞ্জন তঞ্চঙ্গ্যা - বি, এ (অনার্স); এম, এ; বি, এড।
৫। সত্য বিকাশ তঞ্চঙ্গ্যা - বি, এস, সি; বি, এড।
৬। মংচানু তঞ্চঙ্গ্যা - বি, এ।
৭। দীন নাথ তঞ্চঙ্গ্যা - এল, এল, বি (অনার্স); এল, এল, এম।
৮। রেণু তঞ্চঙ্গ্যা - বি, এ।
৯। দীপ্তিময় তঞ্চঙ্গ্যা - বি, এসসি; সি, বি, ই।
১০। আদোই রঞ্জন তালুকদার - বি, এ।
১১। বীথি তঞ্চঙ্গ্যা - বি, এ; বি, এড; টি, এম, এ।
১২। বিধু ভূষণ তঞ্চঙ্গ্যা - বি, এ; বি, এড।
১৩। নিবারণ চন্দ্র তঞ্চঙ্গ্যা - বি, এ।
১৪। জ্যোৎস্না তঞ্চঙ্গ্যা - বি, এ।
১৫। যোগেশ চন্দ্র তঞ্চঙ্গ্যা - বি, এ (অনার্স); এম, এ।
১৬। মিলন কান্তি তঞ্চঙ্গ্যা - বি, এস, এস (অনার্স); এম, এস, এস।
১৭। বাবু লাল তঞ্চঙ্গ্যা - বি, এ।
১৮। স্নিগ্ধা তঞ্চঙ্গ্যা - এম, এ।
১৯। রাজেন্দ্র লাল তঞ্চঙ্গ্যা - বি, এ (অনার্স); এম, এ।
২০। কৃত রঞ্জন তালুকদার - বি, এস, এস (অনার্স); এম, এস, এস।
২১। মিতালী তালুকদার - এম, বি, বি, এস
২২। সুলেখা তঞ্চঙ্গ্যা - এম, এ (পরীক্ষার্থী)।
২৩। অমিতা তঞ্চঙ্গ্যা - এম, এ (পরীক্ষার্থী)।
২৪। জ্যোৎস্না তঞ্চঙ্গ্যা - বি, এস, সি।
২৫। উৎপল তঞ্চঙ্গ্যা - বি, এ।
২৬। বিশ্বজিত তঞ্চঙ্গ্যা - বি, এ।
২৭। দীপন তঞ্চঙ্গ্যা - বি, এস, সি।
২৮। ক্ষেম রঞ্জন তঞ্চঙ্গ্যা - বি, এ।
২৯। প্রভাত চন্দ্র তালুকদার - বি, এ।

৩০। নির্মল চন্দ্র তালুকদার- - বি, এ।
৩১। দয়ারাম তঞ্চঙ্গ্যা - বি, এ।
৩২। সুনীল কান্তি তঞ্চঙ্গ্যা - বি, এ।
৩৩। চিত্ত রঞ্জন তঞ্চঙ্গ্যা - বি, এ।
৩৪। মনোরঞ্জন তঞ্চঙ্গ্যা - বি, এ।
৩৫। অমল বিকাশ তঞ্চঙ্গ্যা - বি, এ।
৩৬। জীতা তালুকদার - বি, এ।
৩৭। সুপ্তা তঞ্চঙ্গ্যা - বি, এ।
৩৮। হরিশ চন্দ্র তঞ্চঙ্গ্যা - বি, এ।
৩৯। নন্দীয় তঞ্চঙ্গ্যা - বি, এ।
৪০। রূপশ্রী তঞ্চঙ্গ্যা - বি, এ।
৪১। প্রদীপ কুমার তঞ্চঙ্গ্যা - বি, এ।
৪২। দীলিপ কুমার তঞ্চঙ্গ্যা - বি, এ।
৪৩। উদয় শংকর তঞ্চঙ্গ্যা - বি, এ।
৪৪। অনুপম তঞ্চঙ্গ্যা - বি, এস, সি; বি, ই।
৪৫। বিধান চন্দ্র তঞ্চঙ্গ্যা - বি, এস, সি।
৪৬। বোধি চন্দ্র তঞ্চঙ্গ্যা - বি, এ।

☼ ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার

১। নব কুমার তঞ্চঙ্গ্যা (বর্তমান উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী)
২। দুদুরাম তঞ্চঙ্গ্যা
৩। কাঞ্চন তঞ্চঙ্গ্যা
৪। সুদত্ত তঞ্চঙ্গ্যা।

☼ কৃষি ডিপ্লোমাধারী

১। রজনী কান্ত তঞ্চঙ্গ্যা
২। শিরোমণি তঞ্চঙ্গ্যা
৩। নন্দীয় তঞ্চঙ্গ্যা
৪। দিব্যেন্দু তঞ্চঙ্গ্যা।

তঞ্চঙ্গ্যাদের ভাষার নিজস্ব ও অনুকরণ শব্দ

অতীতে তঞ্চঙ্গ্যাদের ভাষা ও সংস্কৃতি অহমীয়াদের ভাষা সংস্কৃতির পর্যায়ে অন্তর্ভূক্ত করা যেতে পারে। আরাকানে দীর্ঘ প্রবাস জীবনে সেখানকার স্থানীয় লোকের সাথে সামাজিক ও ধর্মীয় বন্ধন এমনকি ভাষা শব্দ অনুকরণ পরিলক্ষিত হয়। যে কারণে তঞ্চঙ্গ্যাগণ তখন থেকেই বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী যখন আরাকানে অবস্থান করেছিলো। নিজস্ব ব্যবহৃত শব্দ, অনুকরণ ও মিশ্রণ শব্দ নিম্নে কয়েকটি উদ্ধৃতি করা গেলো।

তঞ্চঙ্গ্যাদের ব্যবহৃত ধর্মীয় শব্দ ও বাংলা অর্থ

ফরা তারা সংঘ - বুদ্ধ ধর্ম সংঘ
পাইঞ্চাং - ভিক্ষু
মইঞ্চাং - শ্রমণ
ফুংগ্রী - বয়স্ক ভিক্ষু
সোয়াইং/আক্ভাত - রান্নার পর মুখে দেয়ার আগে
ক্যং - বুদ্ধ বিহার
চিং - মন্দির
চাবাইক্ - ভিক্ষুদের ভিক্ষা পাত্র
মং - বড় কাঁচের ঘন্টা, বাদ্য
চান্দিং - ছোট কাঁচের ঘন্টা
ফাং -প্রার্থনার সহিত নিমন্ত্রণ
ফারিক - শীলদান, মন্ত্রপাঠ
রিজাচা - জলঢেলে উৎসর্গ
ভিলান্ - ভিক্ষা
চাঁই - ভিক্ষুদের পরিধেয় বস্ত্র
ওয়াইক্ - বহু ভিক্ষু সমন্বয়ে মাসব্যাপী পরিশুদধ হওয়া
ঘেইং - উপসম্পদা গ্রহণের পরিশুদ্ধ সীমা
জারি/জাদি - মাটির স্তুপ, চৈত্য
লাচি - মহিলা ব্রহ্মচারিনী
টাংখোয়াইন্ - ধ্বজা, পতাকা
স্রাংডং/শলা ঘ - তিন, পাঁচ বা সাত স্তর বিশিষ্ট মাটির স্তুপ। প্রদীপ ঘর/আলোর ঘর বা প্রদীপ পূজা
ওয়াংগামা - ব্যুহচক্র। বহু চক্র বিশিষ্ট বাঁশের টেংরা দিয়ে তৈরী। প্রবেশ ও বাহির পথ দুটি থাকে। ধর্মীয় উৎসব উপলক্ষে সারারাত ঘুরে ঘুরে নেচে গেয়ে কাটায় যুবক যুবতী।
টামাং টং - ভাত পাহাড়। ধর্মের উদ্দেশ্যে ভাত দিয়ে স্তুপ তৈরী করে উৎসর্গ করা হয়।
চ্যাব - পথিকদের পান্থশালা
গসাইন্ - বুদ্ধ
পৈ - অর্ঘ্যডালা
সাদাং - শীল গ্রহণ
লোথক - ব্রহ্মচর্যা থেকে চ্যুত

তঞ্চঙ্গ্যাদের ব্যবহৃত প্রাচীন শব্দ

অঘা - অশিক্ষিত
অক্ত - সময়
অনসুর - অনবরত, সর্বদা
অনপিন - বোকা বা পাগল ধরনের চরিত্র
অমগড় - সাংঘাতিক
অরক্ - মুরগীর ডিম পারার খাঁচা
হ্অলা - দলের বেপরোয়া সর্দার
অসাঙ্যা - বিবাহ করা যায় না এমন কুটুম
আউক্ - চিত্র
আচু - দাদু
আচিক্ - অবসর
আগাস্যা - সাংঘাতিক
আগত্-তা - অক্ষরের তারা, বই
আমক্ - অবাক
আলাম্ - কাপড়ের নক্সা
আলো ঝালে - পরিমাণের অধিক
আক্যাং - অভ্যস্ত
আরেক্যা - হঠাৎ
হ্আঘা - পায়খানা
হ্আনা - মনে কিছু না করা
আলং - চৌকি
হ্আবাস্যা - লোভী
হ্আউইত্ - আগ্রহ
আব্যাদী - বার বৎসর বয়সের কম বালিকা
আবাইত্ - শব্দ, আওয়াজ
আনুক্যা - চাকমা জাতি
ইচ - ঘরের দুয়ারে মাচাং
ইত্তুক - অল্প
ঈল্ - তৃপ্তি
ঈগুত্/ঈগত্ - অকস্মাৎ
উচি - অতিথিকে আপ্যায়ন
উনা - পরিমাণে কম
উম্ উম্ - সামান্য গরম
ঊব্ - হুঁস, চেতন
উমুস্যা - উষ্ণ
উল্লোয়া - অবাধ্য
এখেইম্ - একাগ্রচিত্ত
এল্ - সবুজ
এমান্ - অবুঝ/পশু
ঔয়ান্চি/ঔয়াইনী - পরিতাপ
কআলা/কচরা - ময়লাযুক্ত
কচমা - কম বয়সী/কচি
কাবিল্ - দক্ষ
কোল্ - ঝগড়া
কারেগা - কেদারা, চেয়ার
কিবা - কৃপা
কেয়াব্ - ফাঁদ
কিচিং - দুই পাহাড়ের মধ্যবর্তী
কুচ্যা/কচমা - কম বয়সী, কচি
কুরুগী - মিষ্টি কথা
কুসালী - অনুরোধ
কুত্যালী/কুত্যারী - অহংকারী, হিংসুক
কুচুক্যা - কুচক্রী
খক্করেই - কাতুকুতু
খুং - পাহাড়ের শিরা
খা - তলোয়ার
গর্বা - অতিথি
গআং - সীমা/ঘেরা
গপ্পোয়া - গল্প যে বেশী করে
গুনাবাই - প্রস্রাব করা
গসাইন্ - বুদ্ধ
গাই গাই - একা একা

গাস্যা - জিদ যে করে
গুচাং/হক - ঋজু
গুনাহার - লোকসান
গাবু - যৌবন
ঘু - মল
ঘিলা - চাকা
ঘুইন্ - চুর্ণ
চগা - শ্মশান
চরগ্ - রূপসাজ
চিছি - কৃপন
চানা/ফেসাং - বারান্দা
চেলা - নেতা
চিক্চিক্যা - নিঃসঙ্গতা
চুচ্যাং - তীক্ষ্ণ
চাংচি/ঈয়অংচিক্ - উচ্চ শিস ধ্বনি
চ্যানা - কৃশ, জীর্ণ
জাঙাল্ - পথ
জগা - চিৎকার
জঘা - মদ জাতীয়
জঘা - মিলিয়ে দেখা
জান্ - জীবন
জারি/জাদি - মাটির স্তুপ
জালিম্ - পটু/সাংঘাতিক
জারগুয়া - অবাঞ্চিত
জিংকানী - জীবন যাত্রা
জু/ছালাং - নমস্কার
ঝাম - দীর্ঘ লম্ফ
ঝারাক্ কারাক্/সেট্রা - এলোমেলো
তারাক্যা - খাদক
তাউম্ - গহীন বন
থাইঞ্চা - অভিমানী
টুক্যাম্ম - মুকুট, টুপি
থাগা - সেবক, দায়ক
দুবা - চামচ
ধাবা - দৌঁড়
ধাব্ - আগ্রহ; পাহাড়ের নিচু স্থান
ধক্ - পঠন
ধেং - দুষ্ট
ধুব্ - সাদা
ধুগু/কন্চাল্ - থলে
ননেইয়া - অনুগত
নমন্সুক/নয়ানসুক - হিজড়া
থারা পৈ - পূজাপকরণের অর্ঘ্যডালা
পক্ত - পরিপুষ্ট
পসা - আসবাবপত্র
পক্তা - মোটা/স্বাস্থ্যবান
পয়াস্যা - রাত্রির শেষ ভাগে
পারল্ - হালকা
পিয়প্য - আনন্দ/উৎসুক
পিষুম - পিশুন, কুৎসা রটনাকারী
পিলাং - বোতল
পাদ্রা - ভীরু
পুইমাল্ - ক্ষেতের উপদ্রপ
পেরেইস্যা - অপরিস্কার থাকা
পেয়ারা - বাবুই পাখি
প্যং - চ্যাপ্টা হওয়া
পৈরাং/মেচাং - ভোজনাসন, বাঁশের তৈরী ভোজন বেত
পল্লান্ - শিকারী
ফং - যুক্ত
ফাগ্ - দল/পৃথক
ফাত্তোয়া - ভবঘুরে
ফুগির - ফকির, সন্ন্যাসী
ফি - দশা জনিত আক্রমণ
ফ্যাগ - তাচ্ছিল্য, নষ্ট হওয়া
বত্তা - আশির্ব্বাদ
বচং - মন্দ
বানা-বানা - অনর্থক

বাংখু - বেঞ্চ
বাংখুরি - চুড়ি
ভং/খবরং - পাগড়ী
ভুত্তাং - ভোঁতা
ভুলুগা - সঙ সাজা
ভুলুক্ চুলুক্ - ফাঁকি যোকি
মগাসান্যা - বিকালের পর ও সন্ধ্যার আগে
মঈন্ - পাহাড়
মালেয়া - বিনা অর্থে পরকে কাজে সাহায্য করা
মুক্ - স্ত্রী
ম্ম - হতভম্ব, উদাস
মোইন্ - পাহাড়
র - শব্দ
বিং/রেইং - উচ্চ স্বরে আহ্লাদ ধ্বনি
রোয়া - গ্রাম
লাং - প্রেমিক
লাংডা - নগ্ন/উলঙ্গ
লাঙ্যা-লাঙ্যনী - প্রেমিক-প্রেমিকা
ল্লাং - সাফ হওয়া
লাত্তং/লাচ্ছুং - বিবাহ বন্ধন
লেবাং - যৌবনে পদার্পন/রূপধারণ
ল্লাবা/ধক্ - শোভন, সুশ্রী
ল্লং খেইং/ল্লং চেইং - শুকরের জন্য তৈরী খাবার দেয়া ছোট গাছের নৌকা
লেলেক্যা - অস্থির
লুবিয়ত্ - আপ্যায়ন
ব্যানী - প্রসূতি
ব্যাক্ - সব
সয়াল্ - তর্ক
সাঙা - বিবাহ, বিবাহের আয়োজন, মিলন
সারুয়া - ভাষাহীন পশু
সাঙ্যা - বিবাহ করা যায় এমন কুটুম
সেরাম্ - ক্ষমতা/সাহস
সাঙাইত্ - সাথী হওয়া
সারাল্যা - কুকি লুসাই পাংখু ওসব নিষ্ঠুর নরহত্যা কারী
সাবাল্যা - ঘটকালী/ঘটক
শয়াল্ - তর্ক
শীরা - শান্ত
শেত্তী - ধনী
শেব্বত্তা - আশির্বাদ
ড়য়াং - নিরুদ্দেশ
য়্যং - ঘুমের ঘোরে কথা বলা
য়্যং য়্যং - চিৎ হয়ে শুলে থাকা

তঞ্চঙ্গ্যাদের সামাজিক আইন

তঞ্চঙ্গ্যা সমাজে যেই যেই সম্পর্কে বিবাহ হতে পারে এককথায় সেগুলোকে বলে ফেল্যা কুরুম বা খেল্যা কুরুম।

বিবাহ হতে পারে না যে সব সম্পর্কগুলোকে গর্‌বা কুরুম বলা হয়ে থাকে। একই পিতৃ রক্ত ধারায় অধঃস্তন পঞ্চম পুরুষ থেকে সম সম্পর্কে বিবাহ হতে পারে। এখানে বিবাহ যোগ্য সম্পর্ক গুলোর আয়োজন তুলে ধরা গেলো ঃ

১। সম সম্পর্কে বিবাহ হয়। সম্পর্ক বিচার পাত্র-পাত্রী উভয়ের বংশস্তর সমান হলে উভয়ের মধ্যে সম বুঝায়। যেমন- বাবা, কাকা, জেঠা, মামা, মা, মাসী প্রভৃতি সম সম্পর্ক।

২। নিঃসম্পর্কীয় যে কোন যুবক-যুবতীর মধ্যে বিবাহ হতে পারে।

৩। বৌদির ছোট বোনকে বিবাহ করা যায়।

৪। ভাই ও বোনের পরস্পরের ছেলে-মেয়েদের মধ্যে বিবাহ হতে পারে।

৫। স্ত্রীর যে কোন সম্পর্কের ছোট বোনকে বিবাহ করা যায়।

৬। শালা কিংবা সম্বন্ধীর স্ত্রী বিধবা কিংবা তালাক প্রাপ্ত হলে বিবাহ করা যায।

যে সব গরবা কুরুম বিবাহ করলে জাতীয় বিচারে সম্মুখীন হতে হয় সে অবৈধ সম্পর্ক গুলোর তালিকা তুলে ধরা গেল ঃ-

১। সহোদর ভাই বোনের বা জেঠা ও কাকার ছেলে মেয়ের বিবাহ হতে পারে না।

২। একই পিতার ঔরসে ভিন্ন ভিন্ন মায়ের গর্ভজাত ছেলেমেয়েদের মধ্যে বিবাহ হতে পারে না।

৩। অসম সম্পর্কে বিবাহ হতে পারেনা। সম্পর্ক বিচারে পাত্র-পাত্রী একই বংশস্তরের লোক না হলে উভয়ের মধ্যে অসম বুঝায়।

৪। যেমন, মামা-ভাগ্নী, খুড়ো-ভাইঝি, মাসী-ভাগ্নে, পিসী-ভাইপো ইত্যাদি।

৫। নিজের স্ত্রীর আপন চাচাতো, মাসতুতো, জ্যেঠতুতো প্রভৃতি বড় বোনকে যে কোন অবস্থাতে এমনকি স্ত্রীর মৃত্যু কিংবা তালাক দেওয়া হলেও বিবাহ করা নিষিদ্ধ।

৬। তালতো ভাইয়ের সাথে মেয়ের বিবাহ হতে পারে না।

৭। লবয়-স্বসন অর্থাৎ ভাইরা ভাই সম্পর্কের মধ্যে একের ভাইয়ের সাথে অপরের বিবাহ হতে পারে না।

বৈধ বিবাহ ঘটিত জাতীয় বিচার পদ্ধতি ঃ

১। বৈধ বিবাহিত স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মনোমিলন না হলে আপোষে উভয়ের মধ্যে ছাড়াছাড়ি অর্থাৎ তালাক হতে পারে। এক্ষেত্রে স্বাক্ষীর স্বাক্ষর যুক্ত **"ছুর কাগজ"** অর্থাৎ তালাক নামী স্ত্রীর বরাবরে সম্পাদন করে দিলেই বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটে। এর শর্তাদি ও উভয় পক্ষের যুক্ত সম্মতিতে আপোষে ঠিক করা হয়ে থাকে।

২। স্বামী স্ত্রী সহবাসে অথবা স্ত্রী স্বামী সহবাসে অক্ষম প্রমাণিত হলে বিবাহ বিচ্ছেদের অনুমতি দেয়া হয়।

[রেফারেন্স ঃ জেলা প্রশাসকের আদালতের ১৯৫৬ ইং ১নং আপীল মোকর্দ্দমা।]

৩। স্বামী কুষ্ঠ, যক্ষা ইত্যাদি এধরনের সংক্রামক ব্যাধিগ্রস্ত হলে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিবাহ বিচ্ছেদের অনুমতি দেয়া হয়। অবশ্য স্ত্রীর পক্ষ থেকে আপত্তি না হলে এ ব্যাপারে সমাজের কর্তব্য কিছু থাকতে পারে না।

৪। স্ত্রীকে অযথা উৎপীড়ন এবং নিষ্ঠুর আচরণ করলে সেই অত্যাচারিতা স্ত্রীকে তার স্বামী থেকে ছাড়াছাড়ি করে দেয়া হয়।

[রেফারেন্স ঃ (১) চাকমা রাজা আদালতের ১৯৪৭ ইংরেজির ৩নং মোর্তফা (মোকর্দ্দমা), (২) চাকমা রাজা আদালতের ১৯৫৯ ইংরেজির ৬৫নং মোর্তফা (মোকর্দ্দমা)।

অপেক্ষাকৃত লঘু অপরাধে প্রথম বারের মতো স্ত্রীর ভবিষ্যৎ নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি সহ স্বামীর কাছ থেকে মুচলেকা নিয়ে স্ত্রীকে স্বামীর হেফাজতে দেয়ার বিধান আছেন।

৫। বধুর প্রতি শশুর শ্বাশুড়ীয় অযথা উৎপীড়ন ও দুর্ব্যবহারের জন্য ব্যকিত্ বিশেষের কাছ থেকে মুচলেকা নিয়ে পৃথকান্নে থাকার জন্য স্বামীর উপর নির্দেশ দেয়া হয়ে থাকে। তবে বারংবার যদি একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি থাকে এবং সব কার্যকরী ব্যবস্থা বিফল প্রমাণিত হলে তখন উভয়ের ছাড়াছাড়ি আদেশ দেয়া হয়।

৬। কেহ গৃহীর জীবন পরিত্যাগ করে স্থায়ী ভাবে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করলে তার স্ত্রী প্রার্থনা মতে স্বামীর অনুমতি ব্যতিরেকে ছাড়াছাড়ি অনুমোদন করে দ্বিতীয় স্বামী গ্রহণ করার আদেশ দেয়া হয়।

এক্ষেত্রে স্বামী যদি মানস মতে কিংবা অস্থায়ী ভাবে প্রব্রজ্যা গ্রহণের পর তার প্রব্রজ্জিত বস্ত্রাদি পরিত্যাগ করে বাড়িতে আসে তাহলে ধর্মীয় ও সামাজিক প্রথা অনুসারে সামাজিক ভোজ দিতে হয়। উক্ত কর্ম সম্পাদন করা না হলে সহবাস করা অবৈধ বিবেচিত হয়ে শুকর দিতে হয়।

৭। কারো যাবজ্জীবন অথবা দীর্ঘ মেয়াদের কারাদণ্ড হলে অথবা নিরুদ্দেশ হয়ে গেলে এবং তার কোন খোঁজ পাওয়া না গেলে সেই ব্যক্তির স্ত্রীর প্রার্থনা মতে ছাড়াছাড়ি অনুমোদন করে দ্বিতীয় স্বামী গ্রহণ করার আদেশ দেয়া হয়।

৮। স্বামীর দোষে বিবাহ বিচ্ছেদ হলে বিবাহের সময়কার সমস্ত বস্ত্রালংকার তালাক প্রাপ্ত স্ত্রী পেয়ে থাকে। যদি বস্ত্রালংকার না থাকে তাহলে সামাজিক আদালত এক বৎসর পর্যন্ত খোরাকী অথবা অর্থ প্রদান নির্দেশ দিতে পারেন।

৯। স্ত্রীর দোষে বিবাহ বিচ্ছেদ হলে তালাক প্রাপ্ত স্ত্রীকে বিবাহে পাওয়া বস্ত্রালংকার ফেরৎ দিতে হয়। তাছাড়া বিবাহের সময় "দাভা" এবং বিবাহের আংশিক খরচ স্বামী ফেরৎ পেয়ে থাকে।

[রেফারেন্স ঃ চাকমা রাজা আদালতের ১৯৫৯ ইংরেজির ৯৭নং মোর্তফা (মোকর্দ্দমা)]

১০। ছাড়াছাড়ির সময় স্বামী সহবাসে কোন সন্তান থাকলে, পুত্র হলে বাপের হেফাজতে আর কন্যা হলে মায়ের হেফাজতে দেয়া হয়। তবে উভয়ের সম্মতিতে এর ভিন্ন ব্যবস্থাও হতে পারে।

১১। ছাড়াছাড়ির সময় স্বামী স্ত্রী সহবাসে দুগ্ধ পোষ্য কিংবা কচি বয়সের পুত্র সন্তান থাকলে তাকে নির্দিষ্ট সময় কালের জন্য মায়ের দায়িত্বে দেওয়া হয়। তালাক প্রাপ্ত স্ত্রী শিশু পালনের খরচ বাবদ আদালতের মাধ্যমে নির্দিষ্ট মাসিক ভাতা পেয়ে থাকে।

১২। অন্তঃসত্বাবস্থায় ছাড়াছাড়ি হলে স্ত্রী স্বামীর কাছ থেকে প্রসবের যাবতীয় খরচসহ আদালত সেই হারে এবং সেই সময়কাল পর্যন্ত মাসিক ভাতা পেয়ে থাকে।

১৩। বিবাহ বিচ্ছেদের বিচ্ছিন্ন দম্পতি ইচ্ছে করলে আবার তাদের মধ্যে বিবাহ হতে পারে। সেক্ষেত্রে প্রথানুসারে চুমুলাং করে সামাজিক ভোজ দিতে হয়।

অবৈধ বিবাহ ঘটিত জাতীয় বিচার ও দণ্ডবিধি ঃ

১। বিবাহের পর সম্পর্ক বিচারে অসাঙ্যা বা গরবা কুরুম অর্থাৎ অবৈধ প্রমাণিত হলে সংশ্লিষ্ট দম্পতিকে ছাড়াছাড়ি করে দেয়া হয় এবং একত্রে বসবাস করার জন্য দুজনকে **"সিনালা"** অপরাধে গুরুদণ্ড দেয়া হয়ে থাকে।

২। উপরোক্ত বিবাহের উদ্যোক্ত, সাহায্যকারী এবং মন্ত্রপাঠদানকারী বলে প্রমাণ পাওয়া গেলে এমনকি অপরাধীর পিতাকেও দোষী সাব্যস্থ করে অর্থদণ্ড করা হয়ে থাকে।

৩। জাতীয় বিচার সিনালী অপরাধে পুরুষ আর মহিলা দুই জনকেই অর্থদণ্ড ছাড়াও সামাজিক খানার জন্যে শুকর দেয়ার বিধান আছে। তবে মহিলা অপরাধীর প্রতি লঘু দণ্ড হয়ে থাকে।

৪। জাতীয় বিচারে হেডম্যান অপরাধীকে ২৫ টাকা আর রাজা বাহাদুর ৫০ টাকা (১৯৫৯ ইং আগে) অর্থদণ্ড আদেশ

৫। সিনালা মামলায় দোষী সাব্যস্ত হলে অর্থ দণ্ড, শুকর জরিমানা ছাড়াও অপরাধীকে পুরানো ছেঁড়া স্ত্রীলোকের পিনুইন, ছেঁড়া জুতার মালা, মুরগীর খাঁচা গলায় বেঁধে দিয়ে পাঠা হিসেবে গণ্য করে মুখে কাঁঠাল গাছের পাতা দিয়ে, মাথার চুল তিন ভাগ করে কেটে এবং বাঁশের ঢ্যাঁড়া পিটাতে পিটাতে নিজের অপরাধ উচ্চ কণ্ঠে উচ্চারণ করতে করতে সারা গ্রাম প্রদক্ষিণ করতে হয়। এরপর ক্যাং ঘরে গিয়ে ভান্তের নিকট মন্ত্র শুনে পরিশুদ্ধ হতে হয় এবং অপরাধী যুগলকে বটবৃক্ষের গোড়ায় একশত বার পূর্ণ কলসীর জল ঢেলে দেয়ার নির্দেশ রয়েছে।

৬। অসাঙ্যা বা গরবা কুরুম এর সঙ্গে সিনালী অপরাধে শাস্তি প্রাপ্ত স্ত্রী বা পুরুষ উপরোক্ত নির্দেশগুলো প্রতিপালন না করা পর্যন্ত তাকে সমাজ চ্যুত বলে গণ্য করা হয়ে থাকে। এই সময়ের মধ্যে তাকে নিয়ে সামাজিক ক্রিয়া কলাপ থেকে সম্পূর্ণ রূপে নিষিদ্ধ ঘোষণা দেয়া হয়। একে বলে জারবাদ ও পারবাদ অর্থাৎ জাত থেকে বাদ এবং খানাপিনা থেকে বাদ। উক্ত অপরাধী তার অপরাধ থেকে যতদিন পরিত্রাণ না পায় ততদিন পর্যন্ত কেউ তার সাথে একত্রে খানাপিনা করে কিংবা সামাজিক কাজে অংশীদার হয় সেও সমাজ চ্যুত বলে গণ্য হবে এবং অনুরূপভাবে শাস্তি ভোগ করতে হবে।

৭। জাতীয় বিচারে আরোপিত দণ্ড আপোষে আদায় করা না গেলে কিংবা জবাব দিহির জন্য হাজির করা অসম্ভব হলে জেলা প্রশাসক আদালতের সক্রিয় সাহায্যে ওয়ারেন্ট দিয়ে ধরে এনে উক্ত সামাজিক আদালতে হাজির করা বা বাধ্য করার নিয়ম রয়েছে।

[চাকমা রাজা আদালত থেকে সংগৃহীত]

দেবান বা গাবুজ্যা দেবান ঃ

তঞ্চঙ্গ্যাদের দেবান বা গাবুজ্যা দেবান নামে প্রচলিত মৌখিক পদবী এককালে ছিলো। চাগ্‌লা বা এলাকা ভিত্তিক বয়োজ্যেষ্ঠ এমন যুবকই এই পদে অধিষ্ঠিত হতে পারতো। তবে বিবাহের পর এ পদাধিকার থেকে বঞ্চিত হয়ে তার ক্ষমতা অপসারিত হয়। এলাকার সকল যুবক-যুবতীদের উপর সামাজিক আইন ও নিয়ম কানুন একমাত্র দেবানের ভূমিকা অগ্রগণ্য হিসেবে বিবেচিত হয়ে থাকে। তার আয়ত্তাধীন এলাকার মধ্যে অন্য এলাকার কোন যুবক অনুমতি ব্যতিরেকে কারোর বাড়িতে রাত্রি যাপন করে কিংবা কোন যুবতীর সহিত অবাধে মেলামেশা করে তাহলে তাকে উচিৎ জবাবদিহি করতে হয়। দেবানের অজ্ঞাতে নিজ এলাকার কোন যুবতী ভিন্ন এলাকায় গমন, রাত্রি যাপন এমন কি মেলা মেজবানে স্বেচ্ছায় গমন করলে এই অমান্যতার কারণে সে যুবতীকে সতর্কীকরণ করা হয়। কোন যুবতী অন্য যুবকের সাথে গোপন প্রণয় করার সন্দেহ, অবৈধ কাজে ধরা পড়া, বিবাহ প্রস্তাব, মা বাবার অজ্ঞাতে অন্য পুরুষের সাথে পালিয়ে বিবাহ কিংবা অসাঙ্যা বা গরবা কুটুমের সাথে যৌন সম্পর্কীত বিষয়ে সন্দেহ করা বা প্রমাণিত হওয়া ওসব ব্যাপারে গ্রাম সালিশের মাধ্যমে নিষ্পত্তি করতে অনেক সময় দেবানকেও অভিযুক্ত করা হয়ে থাকে। কেননা যুবতী নারীদের উপর দেবানের দাবী ও সম্পর্ক থাকে।

তঞ্চঙ্গ্যা ভাষায় প্রবাদ ও প্রবচন

প্রত্যেক জাতির কম বেশী নিজস্ব ভাষায় প্রবাদ ও প্রবচন রয়েছে। ইহা কথার শ্রীবৃদ্ধি, ভাষার একটি অঙ্গ হিসাবে সাহিত্যকেও সমৃদ্ধ করে তোলে। প্রবাদ প্রবচনে যুক্তিপূর্ণ ভাবার্থ ও তার দিক দৃষ্টান্ত গভীর। বাক্যের এককথার ধারায় আনন্দ বা রসাত্মবোধ ব্যাখ্যা প্রদান করে।

বাংলায় প্রবাদ প্রবচন যেমন রয়েছে তেমনি তঞ্চঙ্গ্যাদেরও রয়েছে "বাকধারা" নামে দৃষ্টান্ত প্রবচন। বাকধারা এই শব্দটি মূলতঃ বাংলা থেকে নেয়া।

বাকধারাকে 'কড়ার কড়া' অর্থাৎ কথার কথা এমনও বলে থাকে। তঞ্চঙ্গ্যাদের এই বাকধারা প্রচুর ছিলো একথা অস্বীকার করা যাবে না। সংরক্ষণের অভাবে অনেক বিলুপ্ত হচ্ছে। বাংলা অনুবাদসহ বাকধারা উদ্ধৃতি করা গেলো ঃ-

	তঞ্চঙ্গ্যা		বাংলা
১।	অবুঝরে বুঝেইবে খরক্ বুইত্ ন মানে ঢিঙিরে লাট্যেইবে খরক্ নিত্য ধান ভানে॥	ঃ	অবুঝকে বুঝাবে কত বুঝ নাহি মানে ঢেঁকিকে লাথি দেবে কত নিত্য ধান ভানে॥
২।	আগে গেলে বাঘে খায় পিছে গেলে সনা পায়॥	ঃ	আগে গেলে বাঘে খায় পিছে গেলে সোনা পায়॥
৩।	আগুইন্ ফোইলে ধুমা সয্য গআ পএ॥	ঃ	আগুন পোহালে ধোঁয়া সহ্য করতে হয়॥
৪।	আগুইনর্ কায় ঘি	ঃ	আগুনের কাছে ঘি॥
৫।	আজলে পেলে বাবরে বিয়েই ডাগে॥	ঃ	আলে ডালে পেলে বাপকে বেয়াই ডাকে॥
৬।	আদ্ধানত্তুন্ বেগোনর্ চেত্	ঃ	বেগুনের অর্ধেক থেকে আর একটি বেগুন॥
৭।	আরা শুগায় গেলেঅ ঝাল্ ন কমে॥	ঃ	আদা শুকিয়ে গেলেও ঝাল কমে না।

৮।	আল্‌সিয়া মান্‌স্যত্তুন্ রুগর কড়া বেগ নিচিরা মান্‌স্যত্তুন্ ঘুম যানা বেগ॥	ঃ	অলস মানুষের রোগের কথা বেশী চিন্তাহীন মানুষের ঘুম যাওয়া বেশী।
৯।	আমনর্ আন্দাইজ্ পাগলেও বুসে॥	ঃ	নিজের আন্দাজ পাগলেও বুঝে॥
১০।	আমনর্ বুদ্ধি সনা পরর্ বুদ্ধি রাং আড়াল্যা পাড়াল্যা বুদ্ধি গাইছর্ উবে থাং॥	ঃ	নিজের বুদ্ধি সোনা পরের বুদ্ধি রাং পাড়া পড়শীর বুদ্ধি গাছের উপরে থাকা॥
১১।	আবাইত্ শুনি চাবাইত্ চাবাইত্	ঃ	আওয়াজ শুনে সাবাশ সাবাশ॥
১২।	হ্‌আইস্যুয়া যারে ন বাসে লেচ্যান যারে বাসে॥	ঃ	হাতি যেতে গা লাগে না লেজ যেতে লাগে॥
১৩।	হ্‌আইত দি হ্‌আইত বানে॥	ঃ	হাতি দিয়ে হাতি বাঁধে॥
১৪।	হ্‌আইচ বরা কুআ উম পর কড়ালৈ নারং থুম॥	ঃ	হাঁসের ডিম মুরগীর তা পরের কথায় দিশাহারা॥
১৫।	হ্‌আইসে হ্‌আইসে দলাদলি নল খাগড়া গুরি॥	ঃ	হাতিতে হাতিতে দলাদলি কাঁশ ঝাড় চূর্ণ বিচূর্ণ হয়।
১৬।	হ্‌আইত্ এলে গাইত্ তগাতগি॥	ঃ	হাতি আসলে গাছ খোঁজাখুঁজি॥
১৭।	হ্‌আইত্ মআ কুলা ঢাগি রাগেই ন পে॥	ঃ	হাতিমরা কুলা দিয়ে ঢেকে রাখতে পারে না॥
১৮।	হ্‌আগেরে মান্‌স্যর্ লাইত্ নে দেগেরে মান্‌স্যর্ লাইত্॥	ঃ	যে পায়খানা করে তার লজ্জা নাকি যে দেখে তারই লজ্জা॥
১৯।	হ্‌আত্তে চিনে ত্রী মাত্তে চিনে পুরুইত॥	ঃ	হাঁটতে চেনা যায় স্ত্রী জাতি কথায় চেনা যায় পুরুষ জাতি॥
২০।	উগুন মাড়া আলস্যাত্তুন রাজ্য গপ্পানী ফাত্তোয়াত্তুন্॥	ঃ	উকুন মাথা অলসের আর রাজ্যের গল্প দেয় যে ব্যক্তি অসময়ে অকারণে সারাক্ষণ পরের বাড়ীতে বেড়ায়।

২১। উচিৎ কড়ালৈ বন্ধু বেচার॥ ঃ উচিৎ কথায় বন্ধু বেজার॥

২২। উচান্যা ছেপ ফেলেইলে
নিজর মাড়াত্ পএ॥ ঃ উপর দিকে থুথু ফেললে
নিজের মাথা পড়ে।

২৩। উনা ভারে দুনা বল
বেগ্ খেলে রসাত্তল॥ ঃ কম ভাতে দ্বিগুন বল
বেশী খেলে রসাত্তল॥

২৪। উবে উবে ব বায়
কলগ মারিয়ে মাইত্ ন পায়॥ ঃ উপরে উপরে বাতাস বয়
নিচু স্থলের মাটি টের পায় না।

২৫। উচু আঙুলে ঘি ন উরে॥ ঃ সোজা আঙ্গুলে ঘি উঠে না।

২৬। এআ খিয়া বাঘর্ ডএ
চিত্ খিয়া বাঘ লাগ্ পানা॥ ঃ মাংস ভোজী বাঘের ভয়ে
কলিজা ভোজী বাঘের কবলে পড়া।

২৭। এক পাগল্লৈ পআন্ যার
সাত্ পাগলর্ মেলা॥ ঃ এক পাগলে প্রাণ যায়
সাত পাগলের মেলা॥

২৮। এক মাঘে যা-কাল ন যায়॥ ঃ এক মাঘে শীত যায় না॥

২৯। এক কুবে হাজার টিক্যা ন শেষ ঃ এক কোপে হাজার টাকার
নৌকা শেষ॥

৩০। এক মুগে ঝারি ভাত
দ্বি মুগে লারি ভাত
তিন মুগে কবালত্ হ্আত॥ ঃ এক স্ত্রীতে সহসাৎ ভাত
দুই স্ত্রীতে বিলম্বে ভাত
তিন স্ত্রীতে কপালে হাত॥

৩১। একদিন্যা উলে গর্বা
দ্বি দিন্যা উলে ঘুর্বা
তিন দিন্যা উলে জার্বা॥ ঃ একদিনের হলে অতিথি
দুই দিনের হলে ঘরোয়া
তিন দিনের হলে জারজ॥

৩২। কবা শে বগা॥ ঃ কাকের মাঝে বক॥

৩৩। কানারে আনা দেগানা॥ ঃ অন্ধকে আয়না দেখানো॥

৩৪। কানেরে পআয় দুধ খেই পাই॥ ঃ কাঁদলে শিশু দুধ খেতে পায়॥

৩৫। কারিগজ্যার ভাঙা ঘ
বৈদ্য ঘত্ নিত্য জ॥ ঃ কারিগরের ভাঙা ঘর
বৈদ্য ঘরে নিত্য জ্বর॥

৩৬। কামর্ ডএ ঠাগু হ্অনা॥ ঃ কাজের ভয়ে ঠাকুর (ভান্তে) হওয়া।

৩৭। কেস্যুয়া কুত্তে সাপ নিগে॥ ঃ কেঁচো খুঁড়তে সাপ বের হওয়া।

৩৮। কুগু পেরত্ ঘি ন সয়॥ ঃ কুকুরের পেটে ঘি সহ্য হয় না।

৩৯। কুগু ননেইয়া মুঅত ল্যান্
মুক্ ননেইয়া লাঙর্ পআন॥ ঃ কুকুর অনুনয় বিনয় হলে
মুখে লেহন করে থাকে। স্ত্রী
স্বামীর অনুনয় বিনয়ী হয়ে
শ্রদ্ধা দেখায় প্রেমিকের সাথে
গোপন প্রণয় করার জন্য॥

৪০। কোই জানিলে কড়া
কোই ন জানিলে আড়া॥ ঃ কইতে জানলে কথা
কইতে না জানলে আঠা॥

৪১। কুক্কুরাইয়ে ঝাঅ কুচু
পুন্কাবি তিনবার লাগেইলে
সি কুচু জারত্ উরে॥ ঃ চুলকায় এমন জংলী কচু
নিচের শেষ অংশ কেটে
তিনবার লাগানোর পর পরবর্তীতে
জাত কচু হিসাবে গণ্য হয়।

৪২। কিবিন্যার ধন ফক্করে খায়॥ ঃ কৃপনের ধন ফাঁকিবাজরা খায়॥

৪৩। খর জ্বালায় দেশ ছাল্যুং
তেরোই গাইছ তলাত্ ঘা॥ ঃ টকের জ্বালায় দেশ ছাড়লাম,
তেঁতুল গাছের তলায় ঘর॥

৪৪। খালে ব কুআ রান
দাইল্যে ব বিল ধান॥ ঃ খেলে বড় মোরগের রান
কাটলে বড় বিলের ধান॥

৪৫। খেবার্ দেবার্ ন থেলে ডাইন্ পা
উঅন্ পিনন্ ন থেলে চু পা॥ ঃ খাবার দাবার না থাকলে
ডাইনের মত
গায়ে দেয়ার পরার না থাকলে
চোরের মত॥

৪৬। গম্ শাগ আগা পুগে খায়॥ ঃ পুষ্ট শাকের আগা পোকায় খায়॥

৪৭। গবে সবে মরত্
শিঙে কানে বলদ॥ ঃ গল্পে সল্পে মরদ
শিঙে কানে বলদ॥

৪৮। গাইত্ চিনে বাগলে
মানুষ চিনে আক্কলে॥ ঃ গাছ চেনা যায় বাকলে
মানুষ চেনা যায় আক্কেলে॥

৪৯। গাঙর্ পারত ঘর
নিত্য তার ডর ডর॥

ঃ গাঙের পাড়ে ঘর
নিত্য তার ডর ডর॥

৫০। গারে গারে গলা
হআট্টে হআট্টে নলা॥

ঃ গাইতে গাইতে গলা
হাঁটতে হাঁটতে নলা॥

৫১। গাইছ উবে গুই
খুআ ভাত খেই যেইত্ তুই॥

ঃ গাছের উপরে গোসাপ
খুড়ো ভাত খেয়ে যেও তুমি॥

৫২। গিরত্তর্ সেরাম বুসি
চুএ তিন বক্সা বানে॥

ঃ গৃহস্থের সমর্থ বুঝে
চোরেরা তিন বোঁচকা বাঁধে॥

৫৩। গুইয়্যর কবাল সুরুঙত্,
বান্দ কবাল্ তাঙত্,
মেলা কবাল ওলোন্শালত্॥

ঃ গোসাপের কপাল সুড়ঙ্গে,
বানরের কপাল উঁচু দেয়ালের
পাহাড়ে এবং মহিলার
কপাল পাকশালে॥

৫৪। ঘ উন্দে বেচাগা কামায়॥

ঃ ঘরের ইঁদুর ঘরের বেড়া কামড়ায়॥

৫৫। ঘ কড়া যেবাইত্তুন্ কয়
তে হ্অয় পর
ঠিক দিবিয়া যে যায় ঘুম
তাত্তুন উয়ে জ্বর॥

ঃ ঘরের কথা যে বাইরে কয়
সে হয় পর
ঠিক দিন দুপুরে যে যায় ঘুম
তার নিশ্চয় হয়েছে জ্বর॥

৫৬। ঘ ভড়া পআ-ছআ
বেআক্কল্যা নেক্-মুগত্,
শনিদশা রাহু দশা
চুচ্যাং বাশুয়া তা বুগত॥

ঃ ঘরভরা ছেয়ে-মেয়ে
বেআক্কেল স্বামী-স্ত্রীর,
শনিদশা রাহুদশা
তীক্ষ্ণ ধারালো বাঁশটি তার বুকে॥

৫৭। ঘাট্টাল্যা ঘ ঘাট কুলত্॥

ঃ ঘাট মাঝির ঘর ঘাট কুলে॥

৫৮। চিত্ গম উলে
লাঙর পআ বাছে॥

ঃ চিত্ত পবিত্র হলে
প্রেমিকের ঔরসে অবাঞ্ছিত
সন্তান জন্মে॥

৫৯। নিজর্ চুক কানা ঔক,
দেইত্ কানা ন ঔক॥

ঃ নিজের চোখ কানা হোক
তবু দেশ কানা না হোক॥

৬০। চু ধুই ন পেলে
তেম্মাং বসানা॥

ঃ চোর ধরতে না পেলে
পরামর্শে বসা॥

৬১। চুন্ খেই জিল্ ঘা উলে
দৈপেলা গেলে ডআয়॥

ঃ চুনা খেয়ে জিহ্বা ঘা গলে
দৈ এর হাঁড়ি দেখলে ভয় পায়॥

৬২। ছাগল চিগুণ বিচা ডাঙ
মানুইত্ চিগুন কড়া ডাঙ॥

ঃ ছাগল চিকন অণ্ডকোষ বড়
মানুষ ছোট কথা বড়॥

৬৩। ছাগল মুত্তে ধুই ন পেলে
ধুই ন পায়॥

ঃ ছাগল প্রস্রাব করার সময়
ধরতে না পেলে আর ধরা যায় না।

৬৪। জারে জাত তগায়
কাঙায় গাত তগায়॥

ঃ জাতি স্বজাতি খোঁজে
কাঁকড়া গর্ত খোঁজে॥

৬৫। জামেই এক হারাম
বিলেই এক হারাম॥

ঃ জামাই এক হারাম
বিড়াল এক হারাম॥

৬৬। ঝাক্কোয়া কাবিদাঙে
ন কানা হঅয়॥

ঃ দলীয় কাবিল কারিগরে তৈরী
নৌকা তলা ছিদ্র হয়॥

৬৭। ঝাক্কোয়া অসায়
ব্যানী মএ॥

ঃ দলীয় ধাত্রীর দ্বারা
প্রসূতির মৃত্যু হয়॥

৬৮। ঝিয়ে মাই, বৌয়ে শিগানা॥

ঃ ঝিকে মেরে বউকে শিক্ষা দেওয়া॥

৬৯। ঝুল্ থাগরে ঘার
সময় থাক্কে হআর॥

ঃ ঝোল থাকতে ঘাঁট
সময় থাকতে হাঁট॥

৭০। টেঙা দিলে বাঘর চুখ পায়॥

ঃ টাকা দিলে বাঘের চোখ পায়॥

৭১। ঠাগুবা আইস্যে
কলাশ্চয়াবা পাইক্যে॥

ঃ ঠাকুর (ভান্তে) এসেছেন
কলাছড়াটাও পেকেছে॥

৭২। দশর মুএ জয়
দশর মুএ ক্ষয়॥

ঃ দশের মুখে জয়
দশের মুখে ক্ষয়॥

৭৩। দাচ্যা ভাত ন খেলে
তিন প উবাইত থায়॥

ঃ অনুরোধের ভাত না খেলে
তিন প্রহর উপোস থাকতে হয়॥

৭৪। দেগিলে শিগে
আ ঠুগিলে শিগে॥

ঃ দেখলে শিখে
আর ঠকলে শিখে॥

৭৫। দূঅ-গা কুড়ুম ফুল বাইত্
কাইগা কুড়ুম ঘুঅ বাইত॥

ঃ দূরের কুটুম ফুলের সুবাস
কাছের কুটুম মলের গন্ধ॥

৭৬। দুগে কামন্দী টেঙালৈ
কানা গুরু কিনানা॥

ঃ কষ্টে উপার্জিত টাকা দিয়ে
কানা গরু ক্রয় করা॥

৭৭। দুবা মুগাই বাঘ ধাবানা॥

ঃ ঝোঁপঝাড় পিটিয়ে বাঘ দৌড়ানো।

৭৮। দিন মজুরীর ননেয়া পুত
তে খেবার্ চায় বাঘর্ দুধ॥

ঃ দিনমজুরীর ননাইয়া পুত্
সে খেতে চায় বাঘের দুধ॥

৭৯। ডাইনে জাগা পায়
চুএ জাগা ন পায়॥

ঃ ডাইনেরা (রাক্ষস) আশ্রয় পায়
চোরেরা আশ্রয় পায় না॥

৮০। ধার্মিক চিন দানে
বীর পরিচয় রণে॥

ঃ ধার্মিকের পরিচয় দানে
বীরের পরিচয় রণে॥

৮১। ধুব্ কাবত্ কালির দাগ॥

ঃ সাদা কাপড়ে কালির দাগ॥

৮২। নিজর মান নিজে রাগ
কাবা কান চুল্দি ঢাগ॥

ঃ নিজের মান নিজে রাখ,
কাটা কান চুল দিয়ে ঢেকে রাখ॥

৮৩। নিজর ঠেঙত্ খোল মা-না॥

ঃ নিজের পয়ে কুড়াল মারা।

৮৪। নরম পেলে হআ-অ খান
ডর পেলে কাইয়্য ন যান॥

ঃ নরম পেলে হাড়ও খায়
কঠিন পেলে কাছেও যায় না॥

৮৫। পগরা নাগে তিলক্ক ফুরা॥

ঃ খাঁদা নামে তিলক ফোঁটা॥

৮৬। পাচি মানস্যর শবথ
গসাইনেঅ মাপ দে॥

ঃ পাঁজী মানুষের শপথ
বুদ্ধও মাফ করে দেয়॥

৮৭। পেচাবা কুল কুলায়
সনা টুক্যাবা খোল্যায় পায়॥

ঃ পেচা কল-কলানী করে
সোনার টুপিটা কাঠ ঠোকরা পায়॥

৮৮। পণ্ডিতে শিগে দেগিনায়
মুর্খে শিগে ঠুগিনায়॥

ঃ পণ্ডিতেরা শিখে দেখে
মূর্খ শিখে ঠকে॥

৮৯। পথ ভালা বেঙা যা
ভাত ভালা বানা খা॥

ঃ পথ ভালো বাঁকা যাও
ভাত ভাল এমনি খাও॥

৯০।	বর্ গাঙও চানা কাব চোবও ধআনা॥	ঃ	বড় গাঙটাও চাওয়া কাপড় চোপড়ও ধোয়া॥
৯১।	বন বাঘে ন খারে মন বাঘে খায়॥	ঃ	বনের বাঘে না খেতে মনের বাঘে খায়॥
৯২।	বনর্ আগুইন ব্যাগে দেগে মনর্ আগুন ক্যে ন দেগে॥	ঃ	বনের আগুন সব্া দেখে মনের আগুন কেউ দেখে না॥
৯৩।	বাঙাল শাণ্ডা লাম্বা চুল জুম্মোয়া শাণ্ডা কানর ফুল॥	ঃ	বাঙ্গালী বদমাশ লম্বা চুল জুমিয়া বদমাশ কানে ফুল॥
৯৪।	বাঘর্ ছ শেয়াল ন হঅয়॥	ঃ	বাঘের বাচ্চা শিয়াল হয় না॥
৯৫।	বাচান্দী গুইল্যে লোআ গিলে॥	ঃ	প্রশংসা করলে লোহা গিলে॥
৯৬।	বাঘ্যাত্তুন শিয়াল্যা তিনদিন জেট্॥	ঃ	বাঘের চেয়ে শিয়াল তিনদিন জ্যেষ্ঠ॥
৯৭।	বেগ পণ্ডিতে পড় কুএ হআঘে॥	ঃ	অতিরিক্ত পণ্ডিতে রাস্তার পাশে মল ত্যাগ করে॥
৯৮।	বান্দ কিবা গুইল্যে মাড়াত্ উরি বসন্॥	ঃ	বানরকে কৃপা করলে মাথার উপর চড়ে বসে॥
৯৯।	বান্যায় টুকটাক কামাজ্যার এক বায়॥	ঃ	বান্যার হাজার পিটা কামারের এক পিটা॥
১০০।	বারে নয় পুরে চুমাত্ ভোই মুরে॥	ঃ	বাপে পারেনি, পুত্র চোঙ্গায় ভরে মুটে॥
১০১।	বিপদত্ পুলে রাচায় বাপ ডাগে॥	ঃ	বিপদে পড়লে রাজাও বাপ ডাকে॥
১০২।	বুআ কড়া কুআ ঘু গাবু কড়া কাবুগ জু॥	ঃ	বৃদ্ধের কথা মুরগীর মল যুবকের কথা ফাঁদের ছল॥
১০৩।	বুআ বান্দরে গাইত্ বায়॥	ঃ	বুড়া বানরও গাছ বায়॥

১০৪। বোইয়্যা বোইয়্যা খানাত্তুন
ঠাণ্ড হ্অনা গম॥

ঃ বসে বসে খাওয়ার চেয়ে
ঠাণ্ড (ভান্তে) হওয়া ভাল॥

১০৫। ব্যাক তিরা খেই পে
মানস্যর্ তিরা খেই ন পে॥

ঃ সব তিক্ত খাওয়া যায়
মানুষের তিক্ত খাওয়া যায় না॥

১০৬। বৈদ্য বেগ উলে
পেরেল্যা মএ॥

ঃ বৈদ্য বেশী হলে
রোগী মরে॥

১০৭। বৈরা থানাত্তুন
বেগার দেনা গম॥

ঃ বসে থাকার চেয়ে
পরের কাছে বেগার দেয়া ভাল॥

১০৮। বেকুবে পাচ্চ্যায় ভাগ্য
বৈরা খেবার আশায়
চালাগে পাচ্চ্যায় কর্মফল
চেত্তা গুণে ধন বাড়ায়॥

ঃ বেকুবের বিশ্বাস ভাগ্য
বসে খাবার আশায়
চতুরের বিশ্বাস কর্মফল
চেষ্টার গুণে ধন বাড়ায়॥

১০৯। ভাঙা ঠেং গারত্ পএ॥

ঃ ভাঙ্গা পা গর্তে পড়ে॥

১১০। ভাঙেই কুলে রণ গএ
মনত থুলে গুণ গএ॥

ঃ খুলে বললে গণ বাঁধে
মনে রাখলে গুণ করে।

১১১। ভাগ্য বাড়া খেই ন পে
রাজ্য বাড়া যেই ন পে॥

ঃ ভাগ্যের অধিক ভোগ করা যায় না
রাজ্যের বাইরে যাওয়া যায় না॥

১১২। ভাত খায়পে চন বলে
কড় কৈ পে ধন বলে॥

ঃ ভাত খাওয়া যায় তরকারীর বলে
কথা বলা যায় ধনের বলে॥

১১৩। ভাদ নাই যার
জাত নাই তার॥

ঃ যার নাই ভাত
তার নাই জাত॥

১১৪। ভাল্লুগে চায় নাঙান
বাঘে চায় খানান॥

ঃ ভাল্লুক চায় নামটি
বাঘ চায় খাওয়াটি॥

১১৫। ভুইয়্যর গুণে রোয়া
মার গুণে পোয়া॥

ঃ জমিনের গুণে রোপন
মায়ের গুণে সন্তান।

১১৬। ভুত্তোয়া কুগুত্তুন ছ বেগ
মআ মআ মানস্যত্তুন
খানা বেগ॥

ঃ মনিব ছাড়া কুকুরের বাচ্চা বেশী,
শীর্ণ মানুষের খাওয়ার
লোভ বেশী।

১১৭।	মরত্তুনর চবা ঠিক নাই মেলাত্তুন ঘ ঠিক নাই॥	ঃ	পুরুষদের শ্মশান ঠিক নাই মহিলাদের স্বামীর ঘর ঠিক নাই॥
১১৮।	মা মুলে বাপ তালেই॥	ঃ	মা মরে গেলে বাপ তালৈই হয়॥
১১৯।	মানুইত নট্য উলে চন্ নট্য ঝুলে॥	ঃ	মানুষ নষ্ট অবহেলায় তরকারী নষ্ট ঝোলে॥
১২০।	মাগানা পেলে বাবনে মদ খায়॥	ঃ	মাগনা পেলে ব্রাহ্মণেরা মদ খায়॥
১২১।	মানিলে তুলসী ন মানিলে সাবাং॥	ঃ	মানলে তুলসী না মানলে সাবাং (তুলসী)॥
১২২।	মেলা রাক্ষইত্ পেলা ডাঙ, মরত্ রাক্ষইত্ জুম ডাঙ॥	ঃ	মহিলা রাক্ষসী হাঁড়ি বড়, পুরুষ রাক্ষস জুম বড়॥
১২৩।	মুঅর গুণে বেঙ্ মএ॥	ঃ	মুখের দ্বারা ব্যাঙ মরে॥
১২৪।	মুক্কোআ গম ন উলে নেগর্ দুখ্ নেক্কোআ গম ন উলে মুগর্ দুখ্, মুক্কোআ গম, নেক্কোআ গম সি জিংকানীত্ জনম্ সুখ॥	ঃ	স্ত্রী সৎ না হলে স্বামীর দুঃখ স্বামী সৎ না হলে স্ত্রীর দুঃখ, স্ত্রী সৎ, স্বামী সৎ সে দাম্পত্য জীবনে চির সুখ॥
১২৫।	ম্ম গুরুর লাড়ী ডাঙ॥	ঃ	স্থির তন্ময় গরুর লাথি বড়॥
১২৬।	যাত্তুন আঘে টেঙা তার কড়া বেঙা যাত্তুন আঘে ধান তা কড়া টান॥	ঃ	যার আছে টাকা তার কথা বাঁকা, যার আছে ধান তার কথা টান॥
১২৭।	যার জীবনান্ জনম দুখ সুখ তার দরকার নাই॥	ঃ	যার জীবন জনম দুঃখ সুখ তার প্রয়োজন নেই॥
১২৮।	যার কামে যারে সাজে আর কামে লারি মারে॥	ঃ	যার কাজে যারে সাজে অন্য কাজে লাথি মারে॥

১২৯। যা জগরে চু গএ
তেঅ কয় চু॥
ঃ যার লাগি চুরি করে
সেও বলে চোর॥

১৩০। যার বাপে ন চিনে ঘু পুচা
তার পআ দেশত বড় অসা॥
ঃ যার বাপ চিনেনা মলের স্তুপ
তার ছেলে দেশের বড় ওঝা॥

১৩১। যি গুরু দুধ দে
সি গুরু লাড়ি মাল্যেয় গম॥
ঃ যে গরু দুধ দেয়
সেই গরু লাথি মারলেও উত্তম॥

১৩২। যি ফুল নিন্দে
সি ফুল পিন্দে॥
ঃ যেই ফুল নিন্দে
সেই ফুল পিন্দে॥

১৩৩। যি কুণ্ড লেইত্ বেঙা
চুমাত্ ভোইলেঅ উচু ন হঅয়্॥
ঃ যে কুকুরের লেজ বাঁকা
চোঙ্গায় ঢুকালেও সোজা হয় না॥

১৩৪। যি দিনত্ যি কাল্
ঊইঙে চুমি দি গেলাক্
বাঘর্ গাল॥
ঃ যে দিনের যে কাল
হরিণেরা চুমো দিয়ে গেলো
বাঘের গাল॥

১৩৫। যি মারিত আছা খায়
সি মারিত ভর দি উরে॥
ঃ যে মাটিতে আছাড় খায়
সে মাটিতে ভর দিয়ে উঠে॥

১৩৬। যি কুআ বরা পায়
সি কুআর পুনে জানে॥
ঃ যে মুরগী ডিম পাড়ে
সে মুরগীর পুন্দে জানে॥

১৩৭। যি থালাত্ ভাত খায়
সি থালাত্ হআঘে॥
ঃ যে থালে ভাত খায়
সেই থালে পায়খানা করে॥

১৩৮। যে পাদ্রা
তার কানচবা চুলে
তাই ডর লাগায়॥
ঃ যে ভীরু
তার চোয়ালের চুল
তাকে ডর লাগায়॥

১৩৯। যে ন দেগে জীবনৎ সাঙালক্
তাত্তুন শুনিবা বাঘর গপ॥
ঃ যার জীবনে দেখেনি গিরগিটি
তার মুখে শোনা যাবে বাঘের গল্প॥

১৪০। রাচা গএ রাইত্ নীতি
সংসার ধর্ম ঘর গিরিত্তী॥
ঃ রাজা করে রাজনীতি
সংসার ধর্ম ঘর গৃহস্থী॥

১৪১। লাইত্ ন থেলে
তে সাত ভাগ পায়্।
ঃ লাজ না থাকলে
সে সাত ভাগ পায়॥

১৪২।	লাঙর দয়া এক্কোয়া দিন নেগর দয়া চিরদিন॥	ঃ	প্রেমিকের দয়া একটি দিন স্বামীর দয়া চিরদিন॥
১৪৩।	লাইত্ নাই যার দুনিয়া সংসার তার॥	ঃ	লজ্জা নাই যার দুনিয়া সংসার তার॥
১৪৪।	লাড়ি চআরে নাই লাইত্ তা নাং কবিরাজ॥	ঃ	লাথি চড়ে নাহি লাজ তার নাম কবিরাজ॥
১৪৫।	লো শুগ চালত্ উড়ে॥	ঃ	ঘেরায় বন্দী শুকর চালের উপর উঠে॥
১৪৬।	শেরাম নাই যার তিন মুক তার॥	ঃ	সামর্থ্য নাই যার তিন স্ত্রী তার॥
১৪৭।	শূন্যা কড়ালৈ দুন্যা বেয়ানা॥	ঃ	শোনা কথায় দুনিয়া বেড়ানো॥

তঞ্চঙ্গ্যা জাতির ইতিহাস, ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি বিষয়ক আরও অধিক বই পেতে আমাদের মেইল করুন ঃ chandrasen2014@gmail.com এই ঠিকানায়।

বানা (ধাঁধা)

বানা বা বানা-বানি হলো দুরূপ সমস্যা বা কৌতুহল জনক ব্যাপার আর মজার ব্যাপারও। যেমন ছিলো পসন্ (রূপকথা), বারমাস ও পুঁথি তেমনি এককালে মজা করতো বানা-বানি দিয়ে। গল্প দাদুর, দাদীর কিংবা সাথী সংগীদের নিকট বানা সংগ্রহ করে ছেলে-মেয়েরা জটলা বেঁধে এই জ্ঞান জিজ্ঞাসা বা প্রশ্নোত্তর শুরু করতো। আজকাল গ্রামাঞ্চলে বানার প্রচলন নেই বললেই চলে। হারিয়ে যাচ্ছে তঞ্চঙ্গ্যাদের এই সংস্কৃতির অংশ সংরক্ষণের অভাবে। অভাব তাড়না ও অশিক্ষা জীবনে এ জাতির যা কিছু ছিলো তার কিছু উদ্ধৃতি করা গেলো ঃ-

১। বিলর বগা বিলত্ চএ
বিল শুগেইলে বগা মএ॥ = চেয়াগ বাত্তি, তেল

ঃ বিলের বক বিলে চড়ে
বিল শুকালে বক মরে॥ = চেরাগবাত্তি, তৈল।

২। গাইছ উবে পানি কআ॥ = নাইকুল॥

ঃ গাছের উপর পানির কুয়া॥ = নারিকেল।

৩। চাল আঘে তলা নাই
পসা তুবার জাগা নাই। = ছাড়ি।

ঃ চাল আছে তলা নেই
মাল রাখার জায়গা নেই। = ছাতা।

৪। এক বিগুইস্যা মানস্যর
দ্বি বিগুইস্যা দাই
তা গ্যা কামেই কামেই
পআ বুয়া খায়॥ = মুক্যা।

ঃ এক বিগত মানুষের
দুই বিগত দাড়ি
তার শরীর কামড় দিয়ে
ছেলে বুড়ো খায়॥ = ভুট্টা।

৫। চিগুণ লক্ষে কারা
ডাঙ উলে পারা॥ = শন

ঃ ছোট থাকতে কাঁটা
বড় হলে পাতা॥ = শন

৬। মা ভাসি ভাসি গারে
পআবা হআন্নোয়াল গএ॥ = ন, পাঙেই

ঃ মা ভেসে ভেসে স্নানকরে
ছেলে পানি ঘোলা করে॥ = নৌকা, বৈঠা।

৭। কালা শূন্য মঙত্
থালা ভাসে॥ = চান, বেল

ঃ কালো শূন্য কুয়োতে
থালা ভাসে॥ = চাঁদ, সূর্য

৮। ঘ আঘে দআর নাই
মানুইত আঘে র নাই॥ = ওই মুআ

ঃ ঘর আছে দুয়ার নেই
মানুষ আছে শব্দ নেই॥ = উই ভিটা।

৯। শিয়া নাই গ্যানে
মানুইত্ গিলে॥ = সালুম।

ঃ শির নেই শরীরে
মানুষ গিলে॥ = শার্ট

১০। হআসেইলে তগান
পেলে ঘত্ ন নিচান॥ = জাঙাল

ঃ হারালে খুঁজে
পেলে ঘরে নেয় না। = পথ।

১১। কেচেইং ফোএ উগুল্ মাইত্
ঘন ঘন পা হঅয়॥ = থই চুমা

ঃ গিরিপথ পেরিয়ে টাকি মাছ
ঘন ঘন পাড় হয়। = কাপড় তৈরীর সুতা নালী

১২। ই কআ পানি, উ কআত যায়
মুইত্যেগা পানি শুগেই যায়॥ = মদ চআনা

ঃ এই কুয়ার পানি ঐ কুয়ায় যায়
মধ্যবর্তী পানি শুকিয়ে যায়। = মদ চুয়ানী

১৩। ভুক্ গুই পএ, যুইত্ গুই থায়্
ফেলেই এলং গায় গায়
ভাঙেই ন পাল্যে ব্যাক্কান্ খায়
ভাঙেই পাল্যে অদ্দেক খায়॥ = ঘু, হআগানা

ঃ দপ করে পড়ে, চুপ করে থাকে
ফেলে আসে একা একা
উত্তর দিতে না পারলে সবটা খায়
উত্তর পারলে অর্ধেক খায়॥ = মল ত্যাগ

১৪। হ্আত্অ আঘে ঠেংঅ আঘে
গুইয়্যর্অ চাম্
ক্ষেনে ক্ষেনে ডাগে তে
আবনার্ নাঙ॥ = কক্কে

ঃ হাতও আছে পাও আছে
গোসাপের চামড়া
ক্ষণে ক্ষণে ডাকে সে
নিজে নিজের নাম॥ = টট্টে/টক্কে (তক্ষক)

১৫। পহঅর্ পেলে লগে থাং
আন্ধার পেলে লুগেই যাং॥ = ছাবা

ঃ আলো পেলে সাথে থাকি
আঁধার পেলে লুকিয়ে যাই॥ = ছায়া

১৬। তর্ এক্কান্ নিজর্ জিনিই আঘে
স্যান্ তুই কম ব্যবআর্ গঅৎ
কিন্তু অন্য ব্যাক্কুনে ব্যবআর গঅন্
জিনিস্যানর্ নাঙান্ কি? = নিজর নাঙ্

ঃ তোমার একটা নিজস্ব জিনিষ আছে
সেটা তুমি ব্যবহার কর
কিন্তু অন্য সবাই ব্যবহার করে। = নিজের নাম

১৭। তেলা ন মন্, তেলি ন মন্, তার দ্বিবা পআ ন মন্। নআনত্ ধএ ন মন্।
তা-নে ইুকুলত্তুন্ উকুলত্ পা-গৈ দে।

= পত্থন দ্বিবাপআ নত্ উরি উকুলত্ গেলাক্। সিত্তুন্ একজনে নআন্ লৈ উকুলত্ এল।

ইবারত্ ইকুলত্তুন্ তেলা নআন্ লৈ উকুলত্ গেল। সি কুলত্তুন্ আঘেরে পআবা নআন্ ইকুলত্ আনিল। ইবারত্ আ দ্বিবা পআ নত্ উরি উকুলত্ গেলাক্। পআ দ্বিজনত্তুন একজন নআন্ লৈ ইকুলত্ ফি এল। ইবারত্ নআন্ লৈ তেলি উকুলত্ গেল। সিকুলত্ আঘেরে পআবা আ নআন্ লৈ ইকুলত্ এল, সিনে দ্বিজনে উকুলত্ যেই ব্যাক্কুনে পা উলাক্।

ঃ তেলা নয় মণ, তেলি নয় মণ, তাদের দুই ছেলে নয় মণ। আর নৌকায় ধরে নয় মণ। তাদেরকে একুল থেকে ঐকুলে পার করে দাও।

= প্রথমে ছেলে দু'জন নৌকায় উঠে ঐকুলে গেলো। সে কুলে একজন রয়ে গেলো এবং আর একজন নৌকা নিয়ে একুলে এলো। এবার তেলা নৌকা নিয়ে ঐকুলে গেলো। সেকুলের ছেলে নৌকা নিয়ে একুলে এলো। এবার আবার দুটো ছেলে নৌকা নিয়ে ও কুলে গেলো। আবার একজন ছেলে নৌকা নিয়ে ফিরে এলো। এবার তেলি চলে গেলো ওকুলে। সেকুলের ছেলে নৌকা নিয়ে একুলে এলো। একুলের ছেলেসহ দুই ছেলে ওকুলে গিয়ে সবাই পার হলো।

১৮। ই সংসারত্ অনসুর্ দ্বিয়্যান্ তামাশা আইসের যার। রাঙা ছারী এলে মানুইত্ চঅন্, কালা ছারী এলে মানুইত্ ঘুমত্ পঅন্। = দিন্-রাইত্

ঃ এই সংসারে অনবরত দুটি তামাশা আসছে যাচ্ছে। রাঙা ছাতা এলে মানুষ বিচরণ করে, কালো ছাতা এলে মানুষ ঘুমিয়ে পড়ে। = দিবা-রাত্রি

১৯। হআত্অ আঘে, ঠেঙঅ আঘে
মনুষ্যর দিক্যা গণে
ঝড়ত্ ভিচি, রৌদত্ শুগায়
স্যান্ কি কারণে? = বান্দ

ঃ হাতও আছে, পাও আছে
মনুষ্য মতো গণ্য
ঝড়ে ভিজে, রোদে শুকায়
সেটা কি কারণে? = বানর

২০। যার কাল্যা দেঘা নাই
তারি এলে খআন্
লেচৎ ধুই ঘুরেইলে
জুআয় চিত্ পআন্। = বেচোইন্

ঃ শীতকালে দেখা নাই
তাতিয়া আসে খরা
লেজে ধরে ঘোরালে
জুড়ায় চিত্ত পরান॥ = পাখা (হাতপাখা)

২১। পাইত্ ভায়ে তুলে, চব্বিইত্ ভায়ে ঘিরে
এক ভায়ে ঠেলেই দিলে, দয্যার মধ্যে পড়ে॥ = ভাত খানা

ঃ পাঁচ ভাইয়ে তুলে, চব্বিশ ভাইয়ে ঘিরে, এক ভাইয়ে ঠেলে দিলে সমুদ্রের মধ্যে পড়ে। = ভাত খাওয়া

২২। একজন কারিগরত্তুন ২৩ শ্যান্ হ্আত্ত্যার আঘে। সিত্তুন বাইশ্যান চুএ চু গুই নিলে আ কোয়্যান থেব?

= বাইশ নাঙে এক্কান হ্আত্ত্যার বা যন্ত্র নাঙ। কাজেই ২৩ শ্যানত্তুন এক্কান বাইশ ন থেলেঅ থেব ২২ শ্যান।

ঃ একজন কারিগরের ২৩টি হাতিয়ার আছে। সেখান থেকে চোরে বাইশটি চুরি করলে আরও কয়টি থাকবে?

= বাইশ নামে একটা হাতিয়ার বা যন্ত্রের নাম। কাজেই ২৩টির মধ্যে একটি বাইশ না থাকলে আর থাকবে ২২টি।

২৩। ঘ ভিরে ঘ, তা ভিরে মানুইত্
চেরং নাই, পুই থাই, নাই কুন উইত॥ = মুশুরী

ঃ ঘরের ভিতর ঘর, তার ভিতর মানুষ
চেতন নাই, শুয়ে থাকে, নাই কোন হুঁশ। = মশারী

২৪। দুই হআত্ দইত্ আঙুল এক গুইলে
ব্যাক্ খুশি উবাক্ কিচু বুচিলে? = নমইত্কার

ঃ দুই হাত দশ আঙুল এক করলে
সবাই খুশি হবে কিছু বুঝলে? = নমস্কার।

বাদ্যযন্ত্র ও রাগ

বাঁশী, খেংখং, ধুরুক, শিঙা ও চুমা বা মারল্ এই পাঁচটি অতি প্রাচীন ও তঞ্চঙ্গ্যাদের নিজস্ব বাদ্য। বর্তমান সভ্যতার আলোকে আধুনিক ধরনের বাদ্যযন্ত্র ব্যবহারের ফলে ওসব প্রাচীনতম বাদ্যযন্ত্রের মান একেবারেই লুপ্ত হয়ে যায়নি, গ্রামাঞ্চলে এখনও এর চাহিদা রয়েছে। এসব বাদ্যযন্ত্র আমাদের ফেলে আসা শত শত বছরের ঘটনা প্রবাহকে স্মরণ করিয়ে দেয়। অতীতের সুখ দুঃখের চিত্র চোখের সামনে তুলে ধরে।

বাঁশী ঃ

বাঁশীতে বাংলা গানের সুরের মধ্যে যেমন বিভিন্ন রাগের গৎ রয়েছে তেমনি ছন্দের আত্মানুভূতি প্রকাশ পায় তঞ্চঙ্গ্যাদের জুমিয়া বাঁশীতে। মিতিঙ্গা বাঁশের আগার অংশ ১৮´´ - ২০´´ লম্বা এবং ৮ সেন্টিমিটার বেড় পরিমাণ নল দিয়ে এই বাঁশী তৈরী করা যায়। নলের মুখ থেকে ৫´´ ইঞ্চির মধ্যে ১´´ ইঞ্চি পরিমাণ লম্বালম্বি ছিদ্র করে ভেতরের অংশ বিন্‌বিনি নামের মৌমাছির কালামোম দিয়ে বন্ধ করে দিতে হয়। ছিদ্রের মাঝামাঝি স্থানে মুখের উপর শুকনা বাঁশের পাতা বা কাগজ দিয়ে অর্ধেক বন্ধ করতে হয়। ছয়টি ছিদ্র বিশিষ্ট এই বাঁশীর মুখে ফুঁ দিলে বেরিয়ে আসে সুন্দর শব্দ।

সারাদিন ক্লান্তির পর যখন সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসে তখন তঞ্চঙ্গ্যা যুবকেরা শিংকাবায় (ভেতরের বারান্দায়) হেলান দিয়ে মনের ভাষা প্রকাশ করে বাঁশীর মোহনীয় সুরে। আত্তুবা বাঁশ অর্থাৎ কচি থাকতে যে বাঁশের আগা ভেঙ্গে গিয়েছে এমন বাঁশের নল দিয়ে তৈরী বাঁশী দ্বারা চন্দ্রহরণ মন্ত্র সুরে যুবতী রমনীকে বশীকরণ করা যায় বলে কথিত রয়েছে। প্রত্যন্ত অঞ্চলে তঞ্চঙ্গ্যাদের জুমিয়া বাঁশীর সুরের ধ্বনি এখনো থামেনি। অত্যাধুনিক কিংবা অপসংস্কৃতিকে যারা এড়িয়ে চলে তাদের বাড়ীতে শোনা যায় এই বাঁশীর দোলায়িত সুর ধ্বনি।

তঞ্চঙ্গ্যাদের জুম্মোয়া বাঁশীর আদি গাথার সুরের গৎ ঃ

রোদ্রো বাঁশী রোদ্রো রো
মর পআন্ মর বিধো
তুই কুরু মুই ইরু
উএত্ তুরু তুরু উএত্ তুরু তুরু॥
ঔচ্ছ্যাং তুলী কেরাব্ তুলী
ভরা তুলী চাক্কোয়া তুলী
উয়াং তুলী ব্যাঙত্
দয্যা কুলত্ ব্যাঙত্॥
উইঙ ছয়াত্তুন্ পানি খালুং
নল ভাঙি টেক খালুং
লাঙ্যাবী তএ তগারে দুখ্ পালুং
পানি মুঅত্ ডুবিলুং
ও লাঙ্যা ভোইন্ -
তএ ইবারত্ সুখ পালুং॥
রোদ্রো বাঁশী রোদ্রো রো
রোদ্রো বাঁশী রোদ্রো রো
তুই চিরু মুই ইরু
উএত্ তুরু তুরু উএত্ তুরু তুরু
তুই গুলীত্ মুই সারীত্
ও লাঙ্যা ভোইন্ -
আত্তুবা মিরিঙা বাঁশী বাইত্
তলেত্তি বিনিলে ফুগির কানাত্তি
লাঙ্যাবী রিনি চাইত্॥
উএত্ তুরু তুরু বাঁশী সাইত্
ও লাঙ্যাবী -
ম গ্যা কালা মনান সাইত্
যাঙত্ যাঙত্ মুই যাঙত্
রোদ্রো বাঁশী রোদ্রো রো
রোদ্রো বাঁশী রোদ্রো রো॥

সংগ্রহ- বৈদ্য লাল কুমার তঞ্চঙ্গ্যা

খেংখং ঃ

খেংখংনামে বাজনা বাদ্যটি অতি পুরনো কালের। বাঁশের ছোট কঞ্চি দিয়ে তৈরী এটার দৈর্ঘ্য ৫ ইঞ্চি এবং প্রস্থ ১/২ ইঞ্চি বাদ্যটি দুই রানের মাঝখানে আরও একটি জিল বা রীড থাকে। কঞ্চির মাথায় ঝুটিতেবাঁধা ৬ ইঞ্চি লম্বা শক্ত সুতা থাকে। খেংখংটির শেষ অংশ মুখে লাগিয়ে সুতা টানের সাথে বিভিন্ন তালে সুরধ্বনি সৃষ্টি করে। সাধারণত খেংখং মেয়েরা বাজিয়ে থাকে। তারা মনের অব্যক্ত গোপন ভাষা আত্ম প্রকাশ করে, লুকানো রহস্য ভাষা ব্যক্তকরে অন্তরালে কিংবা বিছানায় শুয়ে এ যন্ত্রের মর্মস্পর্শী সুরশ্রী ধ্বনী। খেংখং এই বাজনাটি তঞ্চঙ্গ্যারা বেংবাজা নামেও উচ্চারণ করে থাকে।

বিং বিং খেংখং বিং বিং বিং
ও লাঙ্যা দা
লাঙরে ন দিলে কায় দিন
ফুল গামছা বিছাই দিন
লাঙরে ন দিলে কায় দিন॥
বিং বিং খেংখং বিং বিং বিং
তুই যুদি ডাগইত্ছি ও দা
ফুগির কানা চি দিন॥
বিং বিং খেংখং বিং বিং বিং
তুই যুদি ডাগইত্ছি
পাইত্ পৈরা সাত্ পৈরা
সাঙু পারি দিন
বান্ন্যা দয়াত্তান্ খুলি দিন॥
বিং বিং খেংখং বিং বিং বিং
থবাগ নাক্শা গুচাই দিন
চবাই ন পাল্যে হ্যারে ধুই
টানি তুলি দিন॥
ফুল গামছা বিছাই দিন
ফুল খারী বিছাই দিন
লাঙ্যাদা দ্বি গাল চবা
চুমি দিন-
পড় ভাত মচা মিলি দিন
ফুলর খারী মাড়া লোই
বুগর্ ঘামানী মুছি দিন
বিং বিং খেংখং বিং বিং বিং॥

সংগ্রহ - বৈদ্য লাল কুমার তঞ্চঙ্গ্যা

ধুরুক ঃ

বাঁশী খেংখং বাজিয়ে যেমন নিজের আত্মানুভূতিকে পরিতৃপ্তি করে তোলে, পরকেও দেয় অনাবিল আনন্দ; তেমনি ইশারার সুদূর হাতছানী দেয় ধুরুক নামে বাঁশের বাদ্য বাজিয়ে। ধুরুক বাদ্য হিসাবে পরিচিত হলেও সাধারণত জুমের ফসল রক্ষার কাজে সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন হয়। আবার গভীর বনের শিকারীরা একে অপরের সন্ধান নেয় এই ধুরুকের সংকেত শব্দে। ধুরুক বাজিয়ে তঞ্চঙ্গ্যা যুবকেরা তার ভরা যৌবনের বীরত্বের সাড়া জাগিয়ে তোলে বিরহিনীর লজ্জাবনত অন্তরে। এক সময় দৈনাক তঞ্চঙ্গ্যা যোদ্ধাগণ অক্সাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলো ধুরুকের দুন্ধবীর তালে। এক প্রস্থ পুরু বাঁশের দু'দিকে গিরা রেখে তার মাঝখানে বুকটা ৮-১০ ইঞ্চি লম্বা এবং প্রস্থ ২ ইঞ্চি পরিমাণ চেটে ফেলে দিতে হয়। সেটা নিজের পেটের সাথে লাগিয়ে এক হাত লম্বা একটি গাছের কাঠি দ্বারা ধুরুকের গায়ে বিভিন্ন দ্রুত তাল সৃষ্টি করা যায়। জুমের টংঘর থেকে রাত্রে বাজানো ধুরুকের শব্দ বহুদূর থেকে শোনা যায়। এই ধ্বনি প্রতিধ্বনি চৌদিক নিস্তব্ধ পাহাড়ের বনাঞ্চল মুখরিত হয়ে ওঠে। রাগের দ্রুত তালমাত্রা খুবই উত্তেজনাপূর্ণ ও প্রণয়স্পর্শী।

ধুরুক বেইয়া তুরুক্ তুক্
দিনে দিনে কুলি যুগ
বাড়ৈই বরা শিল ধক
লাঙ্যা ভোইনে ন দিগিলে
মত্তুন ঔই যায় মন দুখ॥
টে-ট্রে নাদো টে-ট্রে দো
ও চিগন ভোইন্
গ্যা কালান রানান ধুব
তর ক্যা দুখ মর ক্যা দুখ॥
ও লাঙ্যা ভোইন্ তএ দিগিলে
ম মনান সুখ
তর-অ দুখ, মর-অ দুখ॥
টে-ট্রে নাদো টে-ট্রে দো
মারি বেগেনা ছাঘী লোইন
ধুরুগ তালেদী ডাগি কোইন্
ও ভোইন্
তর গ্যা কালা
মনান ল্লাবা॥
দুং কে-কে দুং
টে-ট্রে নাদো টে-ট্রে দো
ধুরুক বেইয়া তুরুক তুক্

তর হ্আর পান খিলি খাই পালে
লাঙ্যাবী ম মনান সুখ
টে-ট্রে নাদো টে-ট্রে দো॥
ডগের ঊইঙোয়া হং হং হং
মাড়াত্ ধুই শবথ গং
আসল কড়া ভাঙী কং
শবথ গুল্লুং তএ লং
টে-ট্রে নাদো টে-ট্রে দো॥

সংগ্রহ- বৈদ্য লাল কুমার তঞ্চঙ্গ্যা

শিঙাল বা শিঙা ঃ

শিঙাল বা শিঙা নামের ঐতিহ্যবাহী বাদ্য এককালে তঞ্চঙ্গ্যাদের ঘরে ঘরে দেখা গিয়েছে। বর্তমানে এর ব্যবহার একেবারেই কমে গেলেও অতীতে এর গুরুত্ব অপরিসীম ছিলো। গয়াল বা মহিষের শিং দ্বারা তৈরী এই বাদ্যের ধ্বনী এবং শঙ্খের ধ্বনি কোন তফাৎ নেই। তবে শঙ্খের ধ্বনির চেয়ে এই শিঙালের ধ্বনি বহু দূরে চলে যায়। শিঙের আগার অংশ কিছু কেটে ফেলে সেই ছিদ্রের মুখে ফু দিলে ধ্বনি এর সৃষ্টি হয়। সারাল্যা নামে দুর্ধর্ষ নরমুণ্ড শিকারী পাংখুয়া কুকি জাতিরা এককালে এই অঞ্চলের লোকদেরকে যখন হত্যা করতে আসে তখন গ্রামের লোক পালিয়ে যাওয়ার জন্য এই শিঙাল বাজিয়ে সতর্ক করে দেয়া হয়েছিলো। শান্তি রক্ষা দেবতা হাজির করার উদ্দেশ্যে জনমানবহীন এমন গভীর বনে ফুল-ফল, ধুপ, পিষ্ঠক দ্বারা বৈদ্যরা গভীর রাতে পূজা করতো। মন্ত্র জপ করার শেষে এ শিঙাল তখন বাজানো হতো বলে জানা যায়। আবার শিঙাল একটি কাঠি দ্বারা তাল বাজিয়ে তঞ্চঙ্গ্যা যুবক যুবতীরা এককালে নাচতো। ধুরুগের মতো এই শিঙা দিয়ে দুন্ধবী তাল বাজিয়ে বলী খেলায় চিত্ত উত্তেজক সৃষ্টি করে।

চুমা ঃ

চুমা নামে এই বাদ্যটি বাঁশের এক প্রস্থ চোঙ্গ বা নল। ছেলে-মেয়েদের প্রিয় ও ঐহিত্যবাহী বাদ্য হলেও এর আওয়াজ গ্রামাঞ্চলে আর শোনা যায় না। এক প্রান্তে গিরা এবং অপর প্রান্তে মুখ রেখে এক প্রস্থ বড় ডলু বাঁশের লম্বা চুমা বা চোঙ্গ দ্বারা এই বাদ্য সহজেই তৈরী করা যায়। দুই হাতে দুইটি চুমার গিরার অংশ মাটিতে ঠুকিয়ে ঢোলকের শব্দের মতো দুম্ দুম্ শব্দ বের হয় এবং বিভিন্ন তালের বাজনা সৃষ্টি করা যায়। সামাজিক অনুষ্ঠানে এককালে তঞ্চঙ্গ্যাদের চুমা বাদ্য দিয়ে আনন্দ উৎসব করা এমন প্রচলন ছিলো।

বেলা ঃ

বেলা শব্দটি বাংলায় বেহালা। বেহালা নামের এই বাদ্যটির জন্ম এদেশের নয়, এটা বিদেশী বাদ্য। কিন্তু গীংখুলি গায়কগণ তাদের গীত ও সুর ছন্দের সাথে বেলা যন্ত্র একমাত্র সহায়ক। পাহাড়ী পটু কারিগরেরা মারল গাছ দিয়ে খুব সুন্দর বেলা তৈরী করে থাকে।

তঞ্চঙ্গ্যাদের গছা গুইত্তি (গোত্র গোষ্ঠী)

আরাকানের অক্সাজাতির সাথে চাপ্রে বা সাপ্রে জাতির যুদ্ধ অবসানের শেষে অনেক তঞ্চঙ্গ্যা স্বাধীনভাবে বসবাসের উদ্দেশ্যে রোয়াং ত্যাগ করেন। কিছু অংশ থেকে গেলেও অধিকাংশই চট্টগ্রামের দক্ষিণাঞ্চলে **১২**টি এলাকায় পৃথক পৃথকভাবে বসতি স্থাপন করেন। তাদের জীবন চরিত, স্থান ও দূরত্বের কারণে পরবর্তীতে ভাষার উচ্চারণ সামান্য পার্থক্য দেখা দেয়। ফলে **১২**টি এলাকায় বসবাসরত এই জাতির **১২** তালুক নামে পরিচিত হন এবং **১২**টি গছা গুইত্তি সৃষ্টি হয়। বর্তমানে বাংলাদেশে ৭টি গছা গুইত্তির নাম পাওয়া যায়। অবশিষ্ট ৫টি গছা গুইত্তি চাংমা জাতিতে কিংবা সে ৭টি গছায় অন্তর্ভূক্ত হয়।

চাপ্রে নামের এই তঞ্চঙ্গ্যাদের বর্তমান ৭টি তালুক বা গছা/গুইত্ত/দল এর পরিচিতি দেয়া গেলো ঃ

১। **দৈন্যাগছা** ডেল বা দল	ঃ	পশোই গুইত্তি, পণ্ডিত গুইত্তি, তাঞ্জব গুইত্তি, কালা থংজা গুইত্তি, বন্ধ্যাব গুইত্তি, পিশো গুইত্তি, রাঙেয়া গুইত্তি, বলা গুইত্তি, বাঙাল্যা গুইত্তি, দান্নোয়া গুইত্তি ও খাত্তল গুইত্তি।
২। **মোগছা** ডেল বা দল	ঃ	তাশি গুইত্তি, কবাল্যা গুইত্তি, দাল্লোয়া গুইত্তি, গুণ্যা গুইত্তি, কুরুগ গুইত্তি, হ্যাগারা গুইত্তি ও খুস্যোয়া গুইত্তি।
৩। **কার্‌বয়া গছা** ডেল বা দল	ঃ	গচাল্যা গুইত্তি, ফারাংশা গুইত্তি, বাঙাল্যা গুইত্তি, ল্লাপোস্যা গুইত্তি, আর্‌বয়া গুইত্তি, বক্‌চারা গুইত্তি, তাশি গুইত্তি, বুঙ গুইত্তি ও বলা গুইত্তি।
৪। **মংলা গছা ডেল বা দল**	ঃ	পালংশা গুইত্তি, দারন্যা গুইত্তি, নাবানা গুইত্তি, দেবা গুইত্তি ও কালেয়া গুইত্তি।
৫। **ম্মেলং গছা** ডেল বা দল	ঃ	আমেলা গুইত্তি, আলু গুইত্তি, তেমেলে গুইত্তি ও পক্‌ত গুইত্তি।
৬। **ল্লাংগছা** ডেল বা দল	ঃ	বেদব গুইত্তি, শক্কা গুইত্তি, লাম্বায়া গুইত্তি ও বলা গুইত্তি।
৭। **অঙ্য গছা**	ঃ	এদের গছা গুইত্তির লোক আরাকানসহ বার্মায় রয়েছে। অনেক অনেক পরিবার বার্মা জাতিতে মিশেও গিয়েছে। বাংলাদেশের পার্বত্য জেলায় যেসব অঙ্য গছা এককালে ছিলো তারা সবাই মোগছা ও ধৈন্যা গছার সাথে অন্তর্ভূক্ত হয়। কক্সবাজার জেলার রামু, উখিয়া ও টেকনাফ থানার লোকেরা তারা চাংমা লিখে থাকে।

গছা পরিচিতি ঃ

তঞ্চঙ্গ্যাদের নিজস্ব পোষাক রয়েছে। সাতটি গছার সামাজিক আচরণ পার্থক্য নয়। পুরুষেরা নিজস্ব তৈরী কাবোই শার্ট ও ধুতি বা গামছা ব্যবহার করে। মেয়েদের পরনের পিনুইন ও খাড়ীর নক্সা সামান্য তারতম্যতার কারণে বুঝা যায় সে কোন গছা। গছা ভেদে মহিলাদের পোষাকের সামান্য ব্যবধান থাকলেও মাথায় খবং (পাগড়ী), গলায় বা কাধে গাবা (ওড়না), গায়ে কাবোই (ফুল হাতা ব্লাউজ), কোমরে ফাদ্দুই (কাপড়ের কটি বন্ধনী) এবং পরনের পিনুইন এই পাঁচ পোষাক দৃষ্টি আকর্ষন করে। ওসবের রয়েছে নিখুঁত ও বিভিন্ন নক্সা। খোঁপায়, কানে, গলায়, বুকে, হাতে, পায়ে রূপার গয়না ছাড়াও বুক ভরা ঝুলানো থাকতো পুতির মালা। নাক ফোরা তঞ্চঙ্গ্যাদের নিজস্ব কৃষ্টি নয়, আদিতে এই প্রথা তাদের ছিলো না। রান্নার কাজ ছাড়াও তুলা কাটা, কাপড় বুনার কাজ তঞ্চঙ্গ্যা রমনীদের অবশ্যই জানা থাকতে হয়। ওসব না জানলে তাদের বিবাহ সহজে হয় না বলে এমন কথা এককালে প্রচলিত ছিলো।

তঞ্চঙ্গ্যাদের ৭টি দলে বিভক্ত গছার মধ্যে ভাষা এবং শব্দ স্থান ভেদে সামান্য তারতম্যতা প্রকাশ পায়। তাদের মধ্যে কথোপকথনে বুঝা যায় কে কোন গছা। যাইহোক দাবা (হুক্কা) পান করার এই সংস্কৃতি তাদের নেই বললেই চলে। তবে পাইন্দুক (টুবি) ও চুরুট খাওয়ার সংস্কৃতি রয়েছে।

বাইন্

কোন তঞ্চঙ্গ্যা যুবতী রমনী সুতা কাটা, বাইন বুনা এমন কাজ জানা না থাকলে তার কপালে উপযুক্ত স্বামী লাভ করা কঠিন ছিলো। তাই মেয়েদেরকে রান্নার কাজে অভ্যস্থ হবার আহে চরকার সাহায্যে তুলা থেকে সুতা এবং সেই মিহি সুতা দিয়ে বাইন বুনার শিক্ষা দিতে হয়। নিজের উড়নের পড়নের কাপড় নিজে তৈরী করতে না পারলে বা এ কাজে আত্ম নির্ভরশীল হতে না পারলে অন্যরা তার কানাঘুষা করে। সুতরাং কাপড় তৈরীর জন্য সুতা কাটা, বাইন্ বুনার কাজ কম বেশী জানা অতীতে সবার ছিলো। আবার একই জাতির মধ্যে গোত্র ভেদে কাপড়ের নক্সা বা নমুনা ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টি কেড়ে নেয়। খাড়ী, পিনুই, গাবা, খবং, কাবোই, ফাদ্দুই ও আলাম এসব বুনা কাপড়ের নক্সায় রয়েছে প্রতিটি ফুলের নাম। আবার "আলাম" নামের কাপড়ে বিভিন্ন নক্সার ফুল তুলে স্থায়ীভাবে সংরক্ষণ করা হয়ে থাকে। এই ধরনের কাপড়ের আলাম থেকে নেয়া নক্সা বা ফুলের নাম দেয়া গেলা ঃ-

☼ আই-অ ঠেং ফুল
☼ বেলেই খুইত্ ফুল
☼ আগ্ ফুল
☼ আগত্ তা ফুল
☼ আম ফুল
☼ অরোস্যা ফুল
☼ ইংরাজী আগ ফুল
☼ ঈশ্বর ফুল
☼ উলু ফুল
☼ উর চগলা ফুল
☼ এক জু খৌয়া চুগ ফুল
☼ উইন খুইত্ ফুল
☼ কুআ চুগ ফুল
☼ কাব্ ফুল
☼ কল্পতরু ফুল
☼ কংঅরা জুনি ফুল
☼ কারাল্ মাইচ ফুল
☼ তিবা উলু ফুল
☼ তারা ফুল
☼ টঅ ঐক্য ফুল
☼ থুইত্ জ্যা উলু ফুল
☼ দাবা বৈরক্ ফুল
☼ ডিঙি খআ ফুল
☼ নারে কাইন্ ফুল
☼ পারিচা গাইত ফুল
☼ পদ্ম পারা ফুল
☼ পেলা হাফ্ ফুল
☼ পরিচাবাং ফুল
☼ বেগোইন বিচি ফুল
☼ ব উলু ফুল
☼ ব পদ্ম ফুল
☼ বেলা বুগ ফুল
☼ বেগেনা পেট ফুল
☼ বেচৈন ফুল
☼ কাঙা বিচি ফুল
☼ কেয়াবক্ ফুল
☼ কৈইয়া কা ফুল
☼ কেগ মেগ ফুল
☼ কুত্তি তরা ফুল
☼ খয়াঙ্যা ফুল
☼ খাওয়ান জিয়া পরিচাবাং
☼ খুর কেইঙ ফুল
☼ গসাইন পালং ফুল
☼ গুল চুগ ফুল
☼ গুলা বাচাইয়া পারা ফুল
☼ গুলাটাঙ্যা নারেই কাইন ফুল
☼ চিগন্ পদ্ম ফুল
☼ চর্মা জুনি ফুল
☼ চুর্গ ফুল
☼ জুনি ফুল
☼ বিইট্ গাইত্ ফুল
☼ ব কেয়া বক ফুল
☼ বাক্সু ফুল
☼ ব সেআ ফুল
☼ বাঘ চুগ ফুল
☼ বাইত্ ফুল
☼ মগ ফুল
☼ মরা ফুল
☼ মারেশ্যা ফুল
☼ মাগলঙ দাত ফুল
☼ ম্মামা ফুল
☼ সাঙা বক ফুল
☼ চেআ হআত্ প ফুল
☼ রাম ফুল
☼ হে আ ফুল

পসন্ (কিস্সা বা রূপকথা)

তঞ্চঙ্গ্যাদের পসন্ শব্দটি বাংলায় কিস্সা বা রূপকথা। ঘুম পাড়ানী ছড়া দিয়ে বা দোলনায় দোল দিতে দিতে মা তার শিশু সন্তানকে অলি অলি ... ... বুলি শুনিয়ে ঘুম পাড়িয়ে দেয়। বাংলার সংস্কৃতির মতো তঞ্চঙ্গ্যাদের রয়েছে পসন্ নামে রূপকথা বা গালগল্প। ওসব সংরক্ষণের অভাবে বহু হারিয়ে গিয়েছে ও যাচ্ছে। অথচ এসব নিজস্ব সংস্কৃতি এবং খুব মজার।

রাত্রে ভাত খাওয়ার পর খোলা বারান্দায় চেরাগ বাতি জ্বালিয়ে পসন্ বলা হতো- 'মুলার মত দাঁত, কুলার মত কান, একটি মাত্র চোখ কপালে। সে চোখ ভয়ংকর হিংস্র ভাব। যেন আগুন উড়ে যায়। একটা নয়, দুটো নয়, এক সাথে ডজন খানেক ছেলে মেয়ে গিলে পেটের মধ্যে রাখতে পারে ... ...।" ওসব ভূত রাক্ষসের পসন্ শুনে সবাই ভয়ে গা ঘেষে বসতো। আবার বাঘ ভাল্লুক বানর ইত্যাদি পসন, হাসির পসন শুনে কতো আনন্দ পেতো। যাইহোক কয়েকটি প্রচলিত পসনের নাম দেয়া হলো ঃ-

- আলচিয়া মিদিঙ্যা
- এক বিগৈইশ্যা
- কবী-ধবী
- গুল্-চিনা
- ভুলা-ভুলি
- শেয়াল্যা আ হ্াইত্স্যোয়া
- কলাত্থু কন্যা
- বুজ্যা-বুড়ী আ বাঘ্যা
- বুড়ী আ ভুত্তোয়া
- বেলেই কন্যা
- খুস্যোয়া বেঙ আ সুবাত্তুবী
- শুগ মা
- রাচা ভাগান্যা নাক্কোন্ চিলা
- কাইত্ কন্যা
- শুগবা বাঘ্যা আ পেচাবা
- বুজ্যা বুড়ী
- সুবাত্তুরী আ পেত্তয়া ফিউং
- দাদুঙ্যা-দাদুঙী
- মিরা রাচা
- দুলোক কুনি
- তেন্দেরা
- বেঙ্যা
- মিরা আ পারান্ বন
- ভলা গরু
- চানমুনি সূর্যমুনি
- আল্চিয়া
- উইঙোয়া আ কবাবা বন
- বান্দুরী

জুমিয়া ধান

পার্বত্য অঞ্চলের জুমিয়াগণ প্রায় পঞ্চাশ প্রকারের ধান জুমে বপন করে থাকে। ওসব জুমের ধান সাধারণ বৈশাখের দিকে বপন করে ভাদ্রের শেষের দিকে ফলন পেয়ে যায়। কিছু ধান রয়েছে তিন মাসের মধ্যে ফলন দেয়। একনজ দক্ষ জুমিয়ার মতে ১ আড়ি (১৬ সের) ধান থেকে ১৫-৩০ আড়ি ধান পাওয়া যায়। একবার যে স্থানে জুম করা হয় সে স্থারেন ন্যূনতম ৩/৪ বৎসর পরই পুনঃ জুম চাষ করা যায়। আবার পুরনো ১৫-২০ বৎসর বা তারও বহু আগের জঙ্গল রয়েছে। ওসব স্থানে জুম চাষ করলে ফসল আরো ভাল পাওয়া যায়। মোট কথা জঙ্গল যতো বেশী পুরনো হয় ততই ভাল। সেখানে আগাছা খুব হয় না। আড়ি প্রতি ৪০-৫০ আড়ি বা তারও বেশী ধান পাওয়া গিয়েছে বলে জানা যায়। জুমের ধান সাধারণত পাহাড়ের পূর্ব দক্ষিণ ও পশ্চিম দিকে ভাল হয়। উত্তর দিকের ধান চোকলা হয়।

১। গেলং ধান (সাদা চাউল)
২। গেলং ধান (লাল চাউল)
৩। লেন্দা চিগন
৪। রেংখই ধান (বয়স লম্বা)
৫। রাচা ধান (ধান লম্বা)
৬। রাচা ধান (ধান গোল)
৭। মংকুইধান (ধান গাছের গোড়া বেগুনী রং)
৮। ছেধান/ছেরেধান (ধান বড়)
৯। ছেধান/ছেরেধান (ধান ছোট)
১০। তারুগো ধান (ধান ছোট, ভাত সুগন্ধযুক্ত)
১১। গরাধান
১২। সোরীধান (ভাত সুগন্ধ)
১৩। আমেধান (ভাত সুগন্ধ, পাতা বড় ও লম্বা)
১৪। জেইত্ আমেধান (দানা ছোট, চমৎকার গন্ধ)
১৫। কবক্ ধান
    (১) কালা কবক (সুগন্ধ)
    (২) রাঙা কবব (সুগন্ধ)
    (৩) ধুব কবক (দানা ছোট)
    (৪) শিয়াল কবক
    (৫) লুমব্রো কবক
১৬। তিলংধান
১৭। বারেয়া ধান
    (১) বড় বারেয়া
    (২) ছোটরো বারেয়া
    (৩) চিগন বারেয়া (ভাত চমৎকার সুগন্ধ)
১৮। নাইনছাবেরী ধান
১৯। তুবি ধান (ভাত সুগন্ধ)
২০। মাইখ্যং ধান
২১। কামরাং ধান
    (১) বড় কামরাং
    (২) ছোট কামরাং (ভাত সুগন্ধ)
    (৩) ডলু কামরাং (দানা মোটা)
২২। গিরিং ধান (ভাত চমৎকার সুগন্ধ)
২৩। রাঙেই ধান
২৪। তুরী ধান
    (১) ধান কাল (সুগন্ধ)
    (২) ধান লাল (সুগন্ধ)
২৫। মেহ্লী ধান
২৬। মেলে ধান (ধান লম্বা)
২৭। রামগী ধান

(৬) পেলাং কবক্

২৮। ভুপ্লোই ধান (ভাত সুস্বাদু, ধান গাছের বয়স বেশী)

২৯। পারতিগী ধান (দানা লম্বা, রুচিকর সুগন্ধযুক্ত)

৩০। নাবাদো ধান (ভাত সুগন্ধ)

৩১। কাং গেইন ধান

(১) রাঙা কাং গেইন

(২) কাল কাং গেইন

৩২। তিবী ধান (ভাত সুগন্ধ)

৩৩। লোধা ধান

৩৪। খোরা ধান

৩৫। কুরী ধান

৩৬। লোকা ধান

৩৭। কবা বিবি ধান (চাউল কাল)

৩৮। রাঙা বিনি ধান (চাউল লাল)

৩৯। লক্ষী বিনি (ভাত সুগন্ধ)

৪০। পেরেসা বিনি ধান

৪১। শুগ লো বিনি ধান

৪২। লংকা পরা বিনি ধান

৪৩। রাধা বিনি

৪৪। ফক্সা বিনি (ভাত সুগন্ধ)

৪৫। সনা বিনি

জুমে উৎপাদিত কৃষি জাত

কাইত ঃ

কাইত্ দুই প্রকার। যথা- ভাত কাইত্ ও রাঙা কাইত্। গাছ নল খাগড়ার মতো। লম্বায় ৫/৭ ফুট হয়। গোড়া থেকে ৪/৫ টি বা তারও অধিক গাছের গোছা হয়। প্রতিটি গাছের আগায় একটি করে থোড় বের হয়ে ভাত কাইত্ ছড়া হয়। তুলনামূলকভাবে সাধারণত গমের বীজের চেয়ে বড়। লম্বাকৃতি গোল ও সাদা বর্ণের। রৌদ্রে শুকিয়ে ঢেঁকিতে চেটে চাউল করা হয়। বড় বড় দানার এই চাউল রান্না করলে ভাতের মতো ফোটে এবং খুবই স্বাদযুক্ত আর পুষ্টিকর। রান্না করা কাইত্ ভাত তরকারী ছাড়া খাওয়া যায়। ঢেঁকিতে চাউল গুড়ো করে পিঠা তৈরী করা যায়। কৃষি বিদদের মতে গম ও চাউলের চেয়েও ভাত কাইতের উপাদান রয়েছে। সাধারণত জুমে অযত্নে ও পরিচর্যা ছাড়াই গাছ বড় হয়। মাটি কোপাইয়া একটু যত্ন নিলে ঙ্গ সের থেকে ৫০/৬০ সের বা তারও বেশী কাইত্ পাওয়া যেতে পারে।

এককালে পাহাড়ী রমনীরা কাইতের দানা দিয়ে পুতি মালা তৈরী করে গলায় পরতো বলে জানা গিয়েছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে অর্থাৎ ৪২ এর দুর্ভিক্ষের সময় বহু পাহাড়ী কাইত ভাত খেয়ে জীবন রক্ষা করেছিলো এবং চাষও করেছিলো বলে প্রবীনদের মুখে শোনা গিয়েছে।

ধাগা পং ঃ

ভাত কাইত্ গাছের চেয়ে ডাগা পঙের গাছ আরও লম্বা ও সুদৃশ্য হয়। দানাগুলো গোল ও সাদা এবং ভাত কাইতের চেয়ে একটু ছোট। সাধারণত খৈ এর জন্য জুমে কয়েকটি গাছ রাখা হয়। তবে খৈ খুব ভাল হয়। জুমের ধান কাটার পর ধাগা পং পাকতে থাকে।

মোগলী জেরেনা ঃ

আকৃতিতে ডাগা পঙের মতো। গাছ একটু ছোট। মুলাবিচির মতো দানা তবে গোল ও কাল এবং লাল বর্ণের। ডাগা পঙের মতো দানা দিয়ে খৈ ফুটিয়ে খাওয়া হয়। গাছ মিষ্টি। আখের মতো গাছ চিবিয়ে খাওয়া যায়। ছড়ার দানা ঘন।

ধান জেরেনা ঃ

মোগলী জেরেনার চেয়ে গাছ একটু ছোট। দানা দিয়ে খৈ হয় ও গাছ মিষ্টি বলে রস চুষে খাওয়া হয়।

কোইন্ ঃ

এর চাষ যত্ন সহকারে করা হয় না। একটু যত্নবান হয়ে চাষ করলে ভাল ফলন পাওয়া যাবে। জুমে পোড়া মাটির উপর ছিটিয়ে কিংবা ধানের সাথে মিশিয়ে বপন করা হয়। দুই প্রকারের কোইন দেখা যায়। সোজা উঁচু জাতের কোইন আর অন্যটি থুপ কোইন। থুপ কোইনের ছিটায় কয়েক গুচ্ছ ছড়া থাকে। জুমের ধান পাকার সাথে সাথে কোইনও পাকতে শুরু করে।

কোইন্ খুবই মজার খাবার। প্রাচীন কাল থেকে অতিথি সেবায় মিষ্টি খাবার হিসেবে পাহাড়ীদের কাছে অতি সুপরিচিত। নারকেল, দুখ, চিনি বা গুড় দিয়ে সহজে এই খাবার তৈরী করা যায়। তঞ্চঙ্গ্যাদের মধ্যে এককালে বিষু উৎসব, ওয়া বা বর্ষাবাস অধিষ্ঠানে, প্রবারণা ও হাল পালানী দিনে ঘরে ঘরে কোইন ভাত রান্না করে অতিথি আপ্যায়ন করা হতো। বর্তমান সময়ে বাঙ্গালীদের কাছেও প্রিয় খাবার হিসাবে সমাদৃত।

ঘুচ্যা (তিল) ঃ

পাহাড়ীদের মধ্যে ধান, ঘুচ্যা ও তুলা এই তিন ফসলের নামই জুম। ধান বৎসরের খাবার খোরাকীর জন্য আর ঘুচ্যা ও তুলা বিক্রী করে আর্থিক সচ্চলতার জন্য। সুতরাং পাহাড়ীরা তাদের বাৎসরিক আয়ের উৎস একমাত্র ঘুচ্যা ও তুলা বিক্রয়। ঘুচ্যা তিন প্রকার দেখা গিয়েছে। (১) বীজের ফল সামান্য লম্বা, ঘন সবুজ, (২) বীজের ফল সামান্য গোলাকৃতি, হালকা সবুজ, (৩) কালাঘুচ্যা। ফলের রং সামান্য তফাৎ। ঘুচ্যার বীজ লালচে সাদা ও কালো। ইহা ছাড়া "নাগাঘুচ্যা" নামে আরও এক প্রকার ঘুচ্যা আছে। এই ঘুচ্যার গাছ পাতা ও দানা ভিন্ন। সাধারণত ইহা তরকারীতে খাওয়া হয়।

ঘুচ্যার চাষ পৃথক পৃথকভাবে কোন জুমিয়াকে চাষ করতে দেখা যায়নি। ধানগাছ অনিষ্ট করেনা বলে ঘুচ্যাগাছ জুমে বেশী দেখা যায়। বর্তমান সময়ে এর চাহিদা রয়েছে। কিন্তু ন্যায্য দামের অভাবে জুমিয়া কৃষকগণ ঘুচ্যা ও তুলার চাষ কমাতে বাধ্য হয়েছে।

মুক্যা বা ভুট্টা

মুক্যা বা ভুট্টা নামে এই চাষ কোন পৃথকভাবে হয়না। শুধুমাত্র জুমে ধান গাছের ফাঁকে ফাঁকে গাছ রাখা হতো। আজকাল কচু আদা বা অন্যান্য শাক সবজী বাগানে এমন কি আলাদাভাবে চর জমিনেও চাষ করতে দেখা যায়। বছরে যে কোন ঋতুতে ইহার চাষ করা যায়। মুক্যার কেশগুচ্ছ বা বাঁকল যখন একটু লাল রং ফুটে উঠে তখন মনে করতে হবে খাবার সময় হয়েছে। পাহাড়ীরা সিদ্ধ, আগুনে পুড়ে ও খৈ হিসাবে মুক্যা খায়। পাহাড়ী অঞ্চলে চার প্রকার মুক্যা দেখা যায়। যেমন ঃ

(১) **বিনি মুক্যা** ঃ দানার রং বেগুনী। তবে অন্য রঙেরও আছে। ইহা নরম ও আঠাযুক্ত খুবই স্বাদ।

(২) **রাঙা/ধুব/কালা মুক্যা** ঃ স্বাদ আছে। তবে বিনি মুক্যার মতো নয়।

(৩) **বান্দচের মুক্যা বা সুরান্নুলী মুক্যা** ঃ আকৃতিতে ছোট। তবে সাধারণ মুক্যার চেয়ে লম্বা। ইহার দানা শক্ত। খৈ খুব ভাল হয়।

(৪) **বড় মুক্যা বা কোম্পানী মুক্যা** ঃ এই মুক্যা অন্যান্য মুক্যার চেয়ে বড়। দানাও বড়। স্বাদ কম। বিদেশ থেকে এই দেশে বীজ এনে কৃষি সংস্থার মাধ্যমে বিতরণ হয়েছিলো বলে অনেকেই কোম্পানী মুক্যা বলে থাকে।

পাহাড়ী আলু ঃ

পাহাড়ীগণের কোন আলু খাওয়া যায় কোন আলু খাওয়া যায় না, বংশ বিস্তারের জন্য কোন আলু বীজের উপযোগী তা বহু আগেই জানা ছিলো। ছোটকালে বুড়ো-বুড়িদের নিকট শুনেছি দ্বিতীয় বিশ্ব মহাযুদ্ধে কোটি কোটি মানুষ যুদ্ধে, সাম্প্রদায়িকতায় ও দুর্ভিক্ষে মারা পড়ে। এদেশের হাজার হাজার মানুষ মরে যায় অনাহারে। ওসময় পাহাড়ীগণের মধ্যে যাদের খাবার খোরাকী ধান ছিলো না তারা না খেয়ে মরেনি। তারা লাগানো আলু, জংগলের আলু খেয়ে সুস্থ্যভাবে বেঁচে ছিলো। তাই সমতলের বহু বাঙ্গালী পার্বত্য চট্টগ্রামে আশ্রয় নিয়ে জীবন রক্ষা করেছিলো।

পাহাড়ীরা পরিশ্রম বা পরিচর্যা ছাড়াই আলু উৎপাদন করে থাকে। না লাগানো জংলী আলু মাটির তল থেকে খুঁড়ে এনে রেঁধে, সিদ্ধ করে, আগুনে পুড়িয়ে এমনকি ঢেঁকিতে ছেটে তা রৌদ্রে শুকিয়ে বা সিদ্ধ করে ভাত হিসাবে তরকারী দিয়ে খেতো। লাগানো ও জংলী আলুর উপর কৃষি বিদগণ বর্তমানে গবেষণা করার সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন এবং ইহার উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য পরামর্শ দিচ্ছেন।

নিচে যেসব আলু গিল (খুঁটি) দিয়ে লাগানো হয় তা উল্লেখ করা গেল ঃ

১। মোইন্ আলু (সাদা)
২। পেলা আলু (লাল)
৩। পেলা আলু (সাদা)
৮। বাইত্ তা আলু
৯। হ্আইর ঠেং আলু
১০। ঘুরি আলু

৪। কুরু রেং আলু (লাল)
৫। রেং আলু (সাদা)
৬। বাঙাল আলু
৭। বরা আলু
১১। দুধ আলু
১২। মুরাঙা আলু

যেসব আলু বিনা চাষে জঙ্গল থেকে পাওয়া যায় ঃ

১। পান আলু
২। কয়্যাং আলু
৩। রাম আলু
৪। মোইন আলু
৫। দ্য আলু
৬। তাস্যা আলু
৭। ভুত্তা আলু
৮। তাঙ্যা আলু
৯। বান্দ আলু
১০। কেইসা আলু

কচু ঃ

যেসব কচু জুমে লাগানো হয়ে থাকে।

গৃহ পালিত শুকর না থাকলে বাড়ীর আশে-পাশে লাগানো হয়ে থাকে।

১। মান কচু
২। সাম্মোয়া কচু
৩। মুরাঙা কচু
৪। উল কচু
৫। নাইকুল কচু
৬। বিনি কচু
৭। মদন কচু
৮। কুস্যালী কচু
৯। চিনি কচু
১০। গুরি কচু
১১। বরা কচু
১২। বিল কচু
১৩। কাপ কচু
১৪। এয়া কচু
১৫। গোরেই কচু

জংগলে, ছড়ায় বা ভিজা স্থানে যে সমস্ত জংলী কচু খাওয়া যায় না, তবে সেসব কচুর ডাটা ও আগার দিক খাওয়া যায়। যেমন-

১। বন্দুক কচু
২। উল কচু
৩। বিল কচু
৪। কাপ কচু
৫। এক দায়া কচু
৬। সীল কচু
৭। তিরা কচু
৮। লোংদে কচু

কলা ঃ

মাটি ও আবহাওয়ার ফলে পাহাড়ীয়া অঞ্চলে কলা খুব ভাল জন্মে। বছরে যে কোন সময়ে ফলন পাওয়া যায়। বহু আগে থেকেই পাহাড়ীরা কলা চাষ করে আসছে। এতে বহু পরিবার আর্থিক উন্নয়ন এবং পারিবারিক সচ্ছলতা এখনও পর্যন্ত দেখা যায়।

যেসব কলার গাছ লাগানো হয়ে থাকে তার নাম উল্লেখ করা গেলো ঃ

১। যেইত্ কলা/যাইত্ কলা
২। জাসীকলা
৩। চিনি চম্পা কলা
৪। সূর্যমুখী কলা
৫। খ্যাং কলা
৬। সাগর কলা
৭। গেরেইং কলা
৮। ছাগল শিং কলা
৯। হআত্ বোইয়্যা কলা
১০। পঙলং কলা
১১। চিনি মতন কলা

জংলী কলা ঃ

এই কলার গাছ নিজেই জন্মে। কলা খাওয়া না গেলেও থোড় এবং গাছের ভেতেরর কচি অংশ তরকারী হিসাবে খাওয়া যায়।

১। আচ্যা কলা
২। ঝাবা কলা
৩। গড়া কলা
৪। রাঙা তেল্যা কলা
৫। ধুব তেল্যা কলা

উল/ বেঙের ছাতা/ মাশরুম ঃ

উল পাহাড়ীদের একটি প্রিয় খাদ্য। পাহাড়ীরা উল খায় এজন্য বাঙ্গালীরা থুতু ফেলে তাদেরকে বিদ্রূপ করতো। ইদানিং বাঙ্গালীদের কাছে উল একটি প্রিয় ও দুষ্প্রাপ্য খাদ্য। গাছ, বাঁশ, উই এর ভিটা, খড়, গোবর, পাতা, তুষ, গাছের ভুসি ইত্যাদি থেকে বিভিন্ন প্রকারের উল জন্মে। অভিজ্ঞ ডাক্তারের মতে উলের প্রচুর খনিজ পদার্থ, ক্যালরি, লোহা ও ভিটামিন রয়েছে। ক্যান্সার, ডাইবেটিস রোগ নাশক।

বর্তমান সময়ে জাপানী বিশেষজ্ঞদের দ্বারা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে উল অর্থাৎ মাশরুম উৎপাদনের প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের ব্যবস্থাপনায় বিনা অর্থে রাঙ্গামাটিতে এই যাবৎ কয়েক শতাধিক শিক্ষিত বেকার যুবকদেরকে এই উল বা মাশরুম উৎপাদনের প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে এবং হচ্ছে।

উল বিভিন্ন প্রকারে খাওয়া হয়। উৎকৃষ্ট খাবার হিসাবে জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পায়। ফলে শুকানো উল বিদেশে রপ্তানি করার ব্যবস্থা করা হচ্ছে।

যেসব উল নিজেই জন্মে এবং পাহাড়ীরা কি কি নামের উল খায় তা উল্লেখ করা গেলো ঃ

১। তম্বুউল বা সামু উল
২। বাইত্ উল
৩। খেও উল
৪। কলা উল
৮। গুরত্ত উল
৯। থেন্ থেন্যা উল
১০। আইচ সাং পানাই উল
১১। শুগচিত্ উল

৫। গাইত্ উল
৬। শারী উল
৭। কক্কে উল
১২। ভুই সাঙ্গু উল
১৩। গোবর উল
১৪। ঝুজুরা উল

ফুল

পাহাড়ীদের জুমে বা বাড়ীর আঙিনায় যেসব জুমিয়া ফুল দেখতে পাওয়া যায় এককালে ওসব ফুলের গাছ জংলী ছিলো। বর্তমানে এসব পাহাড়ী ফুলের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে সৌখিন অট্টালিকায় শোভা বর্ধন, বিভিন্ন নার্সারীতে চারা উৎপাদন এবং অধিক মূল্যে বিক্রী করা হচ্ছে।

তঞ্চঙ্গ্যাদের মধ্যে অনেকে যেমন হাজার বাতি জ্বালানোর মানস করে তেমনি হাজার ফুল দিয়ে বুদ্ধের আসনে কিংবা নদীর ঘাটে, বেদীর উপর হাজার ফুল সাজিয়ে মানস কর্ম সম্পন্ন করে। বিষু উৎসবে, পূজায়, জ্যৈষ্ঠজনের নিকট নতজানু হতে ফুল প্রয়োজন হয়। তদুপরি ফুলের মালা দিয়ে বর-কনের বিবাহ বন্ধন ও যুবতী রমনীরা খোঁপায় ফুল গুঁজে প্রসাধনকে আরও আকর্ষণীয় করা হতো। তঞ্চঙ্গ্যাদের ভাষায় কয়েক প্রকার ফুলের নাম ঃ

১। অংমাইনো ফুল
২। আতর ফুল
৩। এক পল্লা রাপাইন্ ফুল
৪। উইন্শিং ফুল
৫। কাট্টলবরা ফুল
৬। কুআ চুলা ফুল
৭। কারা নাশ্ব ফুল
৮। কানই ফুল
৯। চুচ্যাং ফুল
১০। ঝুঝুরা ফুল
১১। গাইত্ গন্ধরক্ ফুল
১২। পুত্তি ফুল
১৩। দবুইয়্যা ফুল
১৪। দ্বপল্লা রাপাইন ফুল
১৫। বিলাতী সীতা ফুল
১৬। ভারাল্ ফুল
১৭। মন্যবং ফুল
১৮। মাই চুমা ফুল
১৯। মুনিক ফুল
২০। মাচ্যাকানৈ ফুল
২১। লাংগেই সীতা ফুল
২২। লো ফুল
২৩। ললক্ ফুল
২৪। লুরি সাবা ফুল
২৫। সঙ্যাজু ফুল
২৬। চুমা ফুল
২৭। সাবা ফুল
২৮। সীতা ফুল
২৯। ধনা ফুল
৩০। রাগাইত্ ফুল
৩১। ভেরা ফুল
৩২। বড়া ফুল

তঞ্চঙ্গ্যাদের শুভ অশুভ বা আচরণ

মানুষের জীবনে সুখ দুঃখ ও অপমৃত্যু হয়ে থাকে তার কৃত কর্মের ফলে। নিজের পরের পরিবারের এমনকি প্রকৃতিরও শুভ অশুভের নিমিত্ত দেখা দেয় বিভিন্নভাবে। এই নিমিত্তের পূর্বাভাসকে আমরা মানতে যেমন চাই না তেমনি অন্যরা পালন করলে তা পরিহাস করি। গ্রহ নক্ষত্র তিথি বার কিংবা পশু পাখি কীট পতঙ্গের দ্বারা শুভ অশুভ লক্ষ্য করা গিয়েছে। যাত্রা কালে শুভ অশুভ 'খনার বচন' থেকে দেখতে পাই-

"শূন্য কলসী ডাঙ্গায় না
শুকনা ডালে ডাকে কা ... ...
... ...
"ভরা হতে শূন্য ভাল যদি ভরতে যায়
আগ হতে পিছে ভাল যদি ডাকে মায় ... ...। ইত্যাদি।

তঞ্চঙ্গ্যাগণের বহু নীতি আচরণ ছিলো। আবার সেসবে ধরা বাধাও ছিলো। যেসব আচরণ বিধি এককালে ছিলো তার কিছু অংশ এরূপ ঃ

১। ঘরের উঠানে, ঘরের চালের সাথে সংযুক্ত বা যাতায়াতের পথে কাপড় শুকানোর বাঁশ কিংবা দড়ি টাঙানো থাকলে তার নিচ দিয়ে যাতায়াত করা অশুভ।

২। ঘরের ভেতরে পাদুকা অর্থাৎ জুতা সেণ্ডেল পায়ে দিয়ে প্রবেশ করা গৃহস্থের অমঙ্গল বলে কথিত রয়েছে।

৩। ঘর থেকে বের হবার সময় দরজায় পা আছড়ানো বা পা ঝাড়া দেয়া গৃহস্থের অমঙ্গল হয়।

৪। ঘর ঝাড়ু দেয়ার পর দরজায় ঝাড়ু আছড়ানো উচিৎ নয়। এরকম করলে সে ঘরে অলক্ষ্মী বাস করে।

৫। যে নারী ঘরের দরজায় চুল আচড়াতে থাকে বা রূপচর্চা করে শাস্ত্র মতে সে নারী অপয়া।

৬। চালের শন, বেড়ার তর্জা খুলে যে রমনী চুলার আগুন জ্বালে সে রমনী চির দুঃখিনী হয়।

৭। পা হেঁচড়াইয়া হাঁটা কুলক্ষণ ও শনির দৃষ্টি পড়ে।

৮। ঘুম থেকে উঠার পর যে রমনী হাত মুখ না ধুয়ে খাদ্য দ্রব্যের উপর হাত দেয় শাস্ত্র মতে সে রমনী কুলক্ষণা ও অলক্ষ্মী হিসাবে গণ্য হয়।

৯। পিড়ায় বসে ভাতের থাল নিচে রেখে বা পায়ের উপর ভাতের থাল রেখে ভাত খেলে সে ঘরে লক্ষ্মী থাকে না।

১০। ভাত খাওয়ার সময় তর্জনী আঙ্গুল উঁচু করে মুখে ভাত দেয়া, জিহ্বা বের করে খাওয়া, চট্‌চট্‌ শব্দ করে খাওয়া এবং পা সামনে টেনে খাওয়া কুচরিত্র স্বভাব বটে তার দুঃখ চিরকাল।

১১। ঘরের চুলার আগুন অন্য জনকে একাধিকবার দেয়া অবিধেয়।

১২। রান্নার পর চুলার ছাই মগা সাসন্যা অর্থাৎ সন্ধ্যায় যে নারী ফেলে দেয় সে নারী কুলক্ষণা।

১৩। ঘরের খাম বা বেড়ার উপরে দা দিয়ে দাগ কাটলে গৃহকর্তা ঋণগ্রস্থ হয়।

১৪। পুড়ে যাওয়া ঘরের খাম (ঠুনি) পুনরায় নতুন ঘরের খাম হিসাবে ব্যবহার করা অকল্যাণকর।

১৫। দুই পাহাড়ের মধ্যবর্তী (কিচিং অর্থাৎ গিরিপথ) স্থানে, ছড়া বা ঝিড়ির শেষ প্রান্তে, পরিত্যক্ত ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের উপর, শ্মশানের উপর, মৃত পাগল কুকুর পুঁতে রাখা স্থানে, পুঁতে রাখা বা পূর্বে পশু মরা স্থানে, পানি চলাচল করে এমন সুড়ঙ্গের উপর, নাগাঘিলু অর্থাৎ যেখান থেকে লাল রঙের ফেনা বা সারাক্ষণ গলিত পানি নির্গত হয় ওসব স্থানে ঘর নির্মাণ করলে রোগ শোক অপমৃত্যু হয় বলে কথিত রয়েছে।

১৬। গুরু স্থানীয় এমন স্ববংশের বয়োজ্যেষ্ঠ জনের ঘরের সম্মুখে কনিষ্ঠ জনের ঘর নির্মাণ করে অবস্থান করা কোন প্রকারেই উচিৎ নয়। এতে রোগ শোক এবং অপমৃত্যু অনিবার্য।

১৭। ঘরের চালের উপর মোরগ উড়ে গিয়ে ডাক দিলে শুভ হয়। আবার কাহারও অশুভ হয়।

১৮। ঘরের মুরগী নরম ডিম পাড়লে অমঙ্গলের পূর্বাভাস। এক্ষেত্রে সবার অজ্ঞাতে মুরগী জবাই করে খেতে হবে। কলাগাছের পেট ফেটে ঠোঁড় বের হলে গৃহস্থের অমঙ্গল বলে কথিত রয়েছে।

১৯। ঘরের চালের উপর চিল পেঁচা বসলে অমঙ্গলের নিমিত্ত। তবে গৃহকর্তা নিজে না দেখে অন্য কেউ জানিয়ে দিলে অমঙ্গল হয় না।

২০। পানির কলসী কোলে তোলার সময় অথবা কোন থেকে হঠাৎ ভেঙ্গে যাওয়া অমঙ্গলের হেতু। এক্ষেত্রে সে রমনীকে আপাদমস্তকে পানিতে ডুব দিয়ে বাড়ীতে প্রবেশ করলে দশা মুক্ত হয়।

২১। স্নান করার পর সে ভিজা কাপড়ের পানি দিয়ে পা ধুয়ে ফেলা অমঙ্গল।

২২। নদীতে, ছড়ায়, গর্তে পায়খানা প্রস্রাব করা খুবই অনুচিত।

২৩। পরের ঘরের চালের পানি নিজের ঘরের চালে পড়া অঙ্গল।

২৪। পরিবারের সদস্যদের মধ্যে কারো যদি ঘরের বাহিরে মৃত্যু হয় তা হলে সে মৃত ব্যক্তিকে ঘরের ভিতর ঢুকানো উচিত নয়, তাকে উঠানে রাখতে হয়।

২৫। যদি একজন কথা বলার সময় অন্য জন কথা কেড়ে নিয়ে কথা বলে তাহলে জেনে রাখা ভাল যে সে ব্যক্তিকে বিশ্বাস করা উচিত নয় এবং তাদের বংশ বিশ্বাস ঘাতক।

২৬। যে সন্তান বৃদ্ধ পিতাকে বাবা ডাকে না বুজ্যা (বুড়া) ডাকে, বৃদ্ধ মাকে মা ডাকেনা বুড়ি ডাকে সে সন্তানের জীবন খুবই কলঙ্কময় হয় এবং সেও তার সন্তানের কাছে অবিশ্বাসী হয়।

২৭। ভাত খাওয়ার সময় পরের মন্দ সমালোচনা করলে নিজের অন্তরে পাপ জমা করা হয়।

২৮। পুরুষ ব্যক্তি জীবনে একবার শ্রমন হবার নিয়ম আছে। শ্রমণ না হলে তার মৃতদেহ আগুনে পোড়ার নিয়ম নেই।

২৯। বৃদ্ধ পিতা মাতাকে শ্রদ্ধার সাথে যে সন্তান সেবা যত্ন করে সে চারি প্রকার অপায় থেকে মুক্ত হয়।

৩০। কাক চিলের পায়খানার মল গায়ে পড়লে সরাসরি ঘরে প্রবেশ করা উচিত নয়। ঘরের বাইরে কাপড় চোপড় সহ স্নান করে তবে গৃহে প্রবেশ করা উচিত।

তঞ্চঙ্গ্যা জাতির ইতিহাস, ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি বিষয়ক আরও অধিক বই পেতে আমাদের মেইল করুন ঃ chandrasen2014@gmail.com এই ঠিকানায়।

দুর্যোগ

দুর্ভিক্ষ ঃ

পলাশী যুদ্ধের পর দেশের সম্পদ কমে যায়। ফলে এর ভয়ংকর প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। গভর্নর কার্টিয়াবের আমলে এই বিপর্যয় শুরু হয় এবং ১৭৭০ সাল থেকে এই উপমহাদেশের ভয়ংকরতম দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। বাং ১২৭৬ সাল বলে ছিয়াত্তরের মন্বত্তর নামে পরিচিত এই দুর্ভিক্ষে এক তৃতীয়াংশ মানুষ মারা যায়।

১৯৪০ সাল থেকে আবার দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। সারা ভারতবাসী বিদেশী পণ্য বর্জন, স্বদেশী পণ্য ব্যবহার এবং বৃটিশের বিরুদ্ধে আন্দোলনের সাড়া পড়ে যায়। দ্বিতীয় বিশ্ব মহাযুদ্ধ তখন চলছে। যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয় দেশের অভ্যন্তরেও। নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের অভাব, পরিব্যাপ্ত হয় রোগ শোক মহামারী। কাজের অভাব, টাকার অভাব, খাদ্যের অভাব। অভাবে মানুষ মরছে তো মরছে অগণিত। একবেলা অন্নের জন্য বুকের সন্তান বিক্রী করতে গ্রামে গ্রামেকতো মা ঘুরেছিলো, কতো যুবতী ও বিবাহিতা স্ত্রী ইজ্জত বিসর্জন দিতে হয়েছিলো এবং সন্তানের কষ্ট সহ্য করতে না পেরে কতো বাবা মা আত্মহত্যা করেছিলো তার ইয়ত্তা নেই।

পার্বত্য চট্টগ্রামের বন পাহাড়ীরা এ দুর্ভিক্ষ শিকার হলেও গুটি কয়েক নিতান্ত অসহায় গরীব মারা গিয়েছিলো বটে জীবিত গরীবরা তারা জংগলের ফল-মূল, শাক-সবজী ও পশু পাখি শিকার করে এবং সে সব খেয়ে জীবন রক্ষা করেছিলো। তবে তঞ্চঙ্গ্যাদের মধ্যে অধিকাংশ লোকেরই খোরাকীর ধান ছিলো বলে প্রত্যক্ষদর্শীর মতে জানা যায়। চোর ডাকাত কিংবা ধান উশুলকারী সরকারী লোকের ভয়ে জমাকৃত ধান বিভিন্নভাবে লুকিয়ে রাখা হয়েছিলো। পুঁজিবাদী মহাজন নামে দাদন সুদের ব্যবসায়ীগণ পাহাড়ীদের গহনা অলংকার খুবই কম টাকায় বন্ধক রাখতো। বিয়াল্লিশের ভাররাদ্ সময়ে সমতলবাসী বহু বাঙ্গালী পাহাড়ীদের আশ্রয়ে এসে জীবন রক্ষা করেছিলো বলে জানা যায়।

পশু-পাখি কীট-পতঙ্গের বন্যা

পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ীদের জীবনে বহুবার দুর্নিমিত্তের প্রকোপ দেখা দিয়েছিলো। স্রষ্টার কি অপূর্ব লীলা। শান্ত ধরিত্রীর বক্ষে পাপের পঙ্কিল বেড়ে যাবার ফলে প্রলয় সংঘাতের পূর্বাভাস দেখা দেয়। প্রকৃতির পরিবেশ দূষণে বা মনুষ্যত্ব বিসর্জনে নয়, পশু-পাখি, কীট-পতঙ্গ দ্বারা 'বন্যা' নামে কয়েকবার দুর্যোগ ঘটেছিলো আমাদের পূর্ব পুরুষের জীবনে। যেমন শুকর বন্যা, ইঁদুর বন্যা, ঘড়িং বন্যা (পঙ্গপাল) এবং মোরগবন্যা নামে অশুভ দৈব বিড়ম্বনা। এইসব বন্যায় শুধুমাত্র জুমের ধান ও অন্যান্য ফসল ধ্বংস হয়েছিলো। ওসব দুর্গতি দ্বিতীয় বিশ্ব মহাযুদ্ধের আগে হয়েছিলো।

শুকর বন্যা ঃ

এক একটি জংলী শুকরের পালে ৬০/৭০টি কিংবা শতাধিকও থাকে। ভারতের আসাম থেকে বার্মা পর্যন্ত একই বৎসরে এই শুকর বন্যার উৎপাত ঘটেছিলো। বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে থাকা শুকরের দল যেদিকে ধাবিত হয় এক রাতে বড় বড় বহু জুমের পাকা ধান ও শাক-সবজী, ফল-মূলের গাছ মুহূর্তে নিঃশেষ করে ফেলে। এরা মানুষ ভয় করে না। সারা পার্বত্য অঞ্চলে শুধু শুকরের ঝাঁক আর ঝাঁক দেখা গিয়েছিলো।

ইঁদুর বন্যা ঃ

সর্বশেষ ইঁদুর বন্যা হয় ১২৭১ বঙ্গাব্দের দিকে। প্রত্যক্ষদর্শীর মতে এক একটি ঝাঁকে পোয়া মাইল ব্যাপী ইঁদুর ছিল। এবং স্বাভাবিক ইঁদুরের চেয়ে একটু বড়। এই ইঁদুর বন পাহাড় অতিক্রম করে, খাল বিল পাড় হয়ে জুমের পাকা ধানের সন্ধানে ছুটতে থাকে। ফলে পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ীদের জুমের ধান ঐবছর ইঁদুর বন্যায় প্রচুর ক্ষতি হয়। শুকর বন্যার আগেও একবার ইঁদুর বন্যা হয়েছিলো।

মোরগ বা মুরগী বন্যা ঃ

পাহাড়ীদের জুমের ধান পাকার সাথে সাথে সারা পার্বত্য অঞ্চলে মোরগ-মুরগীতে ভরে যায়। জুমের ধান প্রচুর ক্ষতি করে।

ফড়িং বন্যা ঃ

বাংলা অর্থ পঙ্গপাল। এই ফড়িং বন্যা বা পঙ্গপাল কোথা হতে কিভাবে পার্বত্য চট্টগ্রামে স্থান বেছে নিলো তা বলা কঠিন। সম্ভবত আন্দমান দ্বীপপুঞ্জ থেকে উড়ে এসে বার্মায় পৌঁছে এবং সেখান থেকে শ্রাবণ ভাদ্র মাসের দিকে পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রবেশ করে। দলবদ্ধভাবে অসংখ্য ফড়িং ঝাঁক যেখানে সেখানে চোখে পড়তো। এক একটি বড় বড় ফড়িং এর ঝাঁকে উড়ে যাবার সময় গরু ছাগলের শরীরে জোড়ে ধাক্কা লাগার

ফলে ভয়ে লেজ তুলে পালাতো। ক্ষেতের ফসল খুবই ক্ষতি হলেও তার অধিক জুমের ফসল ক্ষতি হয়। শিষ ধরা ধান গাছের রস চুষে খেয়ে সারা জুম ধ্বংস করতো।

ল্লাংগেই ডর

পার্বত্য চট্টগ্রামের বসবাসরত যেসব দুর্যোগ পরিলক্ষিত হয়েছিলো কুকিদের আক্রমণ অন্যতম ভয়াবহ। কুকি বলতে সাধারণত লুসাই, পাংখুয়া ও বনযোগীকে বুঝায়। ওরা মানুষ হত্যা করতে বের হতো আর এদিকে ভীত মানুষেরা ঘরবাড়ী ছেড়ে পালিয়ে যায় বলে কুকিদের ঐ সময় **'সারাল্যা'** নামেও অভিহিত করতো। অর্ধ উলঙ্গ ও নিষ্ঠুর তাই তঞ্চঙ্গ্যারা তাদেরকে **'ল্লাংগেই'** নামেও অভিহিত করতো। ওরা সাঁতার কেটে নদী পাড় হবার কৌশল জানে না। সুতরাং কর্ণফুলী নদীর পশ্চিম তীরে যেতে পারেনি বলে কাচলং রাইংখ্যং ও সুবলং এলাকার লোক হত্যা করতে পেরেছিলো। ১৮৩২ খৃঃ থেকে ১৮৭৩ খৃঃ পর্যন্ত অধিকাংশ সময় জুড়ে এই দুঃধর্ষ ল্লাংগেই (কুকিরা) পার্বত্য চট্টগ্রামের চাকমা সার্কেলের উপর হানা দিয়েছিলো। ক্যাপ্টেন টি এইচ লুইনের মতে ১৮৩২ খৃঃ থেকে ১৮৫৪ খৃঃ পর্যন্ত শুধু এই ২২ বৎসরে হামলা চালিয়ে প্রায় দুই শতাধিক লোক হত্যা, অর্ধশতাধিক আহত এবং আড়াই শতাধিক কিশোরী বা যুবতী রমনী মিজোরাম (লুসাই হিলে) ধরে নিয়ে যায়। এছাড়া বহু ঘরবাড়ী জ্বালিয়ে দেয়, লুটপাট ও নারী ধর্ষণ করে থাকে। ভয়াবহ এই দুর্যোগকে তঞ্চঙ্গ্যাগণ তাদের ভাষায় নামে আতংকিত শব্দ **'ল্লাংগেই ডর'** নামে অভিহিত করে।

বর্বর ও নিষ্ঠুর কুকিরা যখন পার্বত্য চট্টগ্রামের বসবাসরত চাকমা তঞ্চঙ্গ্যাদেরকে হত্যা করতে শুরু করে তখন এই প্রসঙ্গে একটি কাহিনী রয়েছে। দল বেধে কিছু সংখ্যক সমতলবাসী বাঙ্গালী বাঁশকাটার জন্য এসেছিলো বিলাইছড়ি এলাকায়। বালু চরে কলাপাতা ছাউনী দিয়ে অস্থায়ী কাট্টান্যা বাসা তৈরী করে রাত্রে সেখানে ঘুমাতো আর দিনের বেলায় বাঁশ সংগ্রহ করতো। কুকিরা নরমুণ্ড শিকারের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়লে পথে এই বাঙ্গালী কাট্টান্যাদেরকে দেখা পায় এবং সাথে সাথে হত্যা করতে উদ্যত হয়। বাঙ্গালীরা তখন করজোড়ে প্রাণ ভিক্ষার আবেদন জানিয়ে বলে, "মোঁ-রে মো, আঁররে ন কাইত্ত্য; দেশত্ গেলে তোঁয়ারর্ পোয়াল্লায় মলা পিঁডা লৈ আস্যুম্ .. ... ।" অবোধ কুকিরা ওসব কথা কি বুঝে। এদের মধ্যে ২/৩ জন পালিয়ে কোন মতে প্রাণ রক্ষা করতে পারলেও বাকী সবাইকে হত্যা করে। খণ্ডিত তিনটি করে মাথা বালু চরের উপর বসিয়ে রান্নার চুলা তৈরী করে এবং সেই মাংস রান্না করে খেয়ে থাকে। এই ঘটনার পর সেই ছড়ার নাম বাঙালকাবা ছড়া বা বাঙালকাটি ছড়া নামে এখনও সেই স্থান সবার মনে স্মৃতি বিজড়িত হয়ে রয়েছে। উক্ত ঘটনার পর একই এলাকায় বৃটিশ সরকারের একটি জরীপ পার্টি বিলাইছড়ি পাহাড়ের উপর তাবু টাঙিয়ে অবস্থান

করছিলো। রাত্রে কুকিরা অতর্কিত হামলা চালিয়ে ২/৩ জন বিদেশী সাহেব সহ আরো কয়েক জনকে হত্যা করে। অনুরূপভাবে সে পাহাড়টির নাম সাবকাবা মইন অর্থাৎ সাহেব কাটা পাহাড় হিসাবে এখনও অতি পরিচিত।

মিজিলিক ডর

মিজিলিক নামে নরবলিদানকারী লোক পার্বত্য অঞ্চলের একটি ভয়বিস্ময়াদি শব্দ। বর্তমান শিক্ষার বাস্তবতার আলোকে এটা অবিশ্বাস্য কিংবা রূপকথার কাহিনী মনে হয়। নৃশংস মিজিলিকের নরহত্যার সংস্কার সম্পর্কে ইতিপূর্বে কোন গবেষক বা লেখক কিছুই ব্যক্ত করতে চাননি। হিন্দুদের সনাতনী ধর্মে পশু ছাড়াও অতীতে নরবলি পূজা কিংবা যজ্ঞপূজা, মুসলমানদের মধ্যে আল্লাহর নামে পশু কুরবানী দেয়ার বিধান রয়েছে। তেমনি যারা মানুষ বধ করে সে রক্ত দ্বারা পূজা সাজিয়ে মানস কর্ম সমাধা করে তাদেরকে বলা হয় মিজিলিক। পার্বত্য চট্টগ্রামের সব ভাষাভাষী লোকের মধ্যে মিজিলিক শব্দটি চাকমা ভাষা। বাংলায় কাপালিক। চাকমা রানী কালিন্দীর শাসনের পরও মিজিলিকের দৌরাত্ম্য ছিলো বলে প্রবীনদের মুখে শোনা গিয়েছে।

ছেলে-মেয়েরা ঘরের একটু দূরে গেলে, কান্না না থামলে তখন বাবা-মা ভয় দেখিয়ে বলতো, "দূরে কোথাও যাবিনা, মিজিলিক এসে বস্তায় ভরে নিয়ে যাবে।" কান্না না থামলেও বলতো, "চুপ, কান্নার শব্দ শুনতে পেলে মিজিলিকরা চুপে চুপে এসে নিয়ে যাবে।" অবশ্য এমন ভয়ের কথা আমার বাবা-মা আমাকেও অনেক অনেক শুনিয়েছিলেন। ছোটকালেও ঠাকুরদার নিকট শুনেছি, আমাদের অমুকের ছেলে ধরে নিয়ে গিয়েছিলো, অমুকের ছেলেকে তাড়া করেছিলো ইত্যাদি রোমাঞ্চকর ঘটনা। শুধু ছেলে-মেয়ে নয়, ওরা সুযোগ পেলে বয়স্ক লোকও ধরে নিয়ে যেতো।

১৯৭৩ ইং সনে বুড়ীঘাট বাজারের পূর্বতীরে কাঠালতলী মৌজা নিবাসী শ্রীকৈলাস ধন চাকমার বাড়িতে দুইদিন অবস্থান করেছিলাম। প্রবীন ভদ্রলোকের বয়স তখন আশি ঊর্ধ্বে। তিনি কামিনী মোহন দেওয়ানের সাথে বৃটিশের বিরুদ্ধে স্বদেশী আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন। বিপ্লবী নেতা মাষ্টারদা সূর্যসেনেরও একজন সহকর্মী যোদ্ধা হিসাবে পরিচিত। লেখাপড়া ভাল জানেন। তিনি আমাকে যেটুকু তথ্য দিয়েছিলেন তা এরূপ ঃ তাঁর বয়স তখন বার কি তেরো ছিলো। ঐসময় তাদের এলাকায় দুইজন মিজিলিক এসেছিলো ছেলে-মেয়ে ধরে নিতে। গ্রামবাসীরা টের পেয়ে তাদেরকে ঘিরে ধরে এবং সবাই মিলে মেরে ফেলে।

এই ঘটনা তিনি স্বচক্ষে দেখেছিলেন বলে জানান। তিনি আরও বলেন মিজিলিক নামের কোন জাতি, বংশ বা গোত্র নেই; পার্বত্য চট্টগ্রামের একমাত্র চাকমা সম্প্রদায়ের মধ্যে এটা দেখা গিয়েছিলো। মিজিলিকের কবলে পড়ে জনৈক বৌদ্ধভিক্ষুর জীবন

উৎসর্গ দিতে হয়েছিলো। রাজ দরবারে এ ব্যাপারে কোন অভিযোগ গ্রহণ করা হয়নি বলে তিনি জানান।

মিজিলিক সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহের জন্য ৩১/১২/১৯৯৫ ইং বান্দরবান পৌর এলাকাধীন বালাঘাটা নিবাসী কবিরাজ শ্রী চিত্র সেন চাকমা এর শরণাপন্ন হই। এককালে তিনি ভালো বাদ্যবাদক, গায়ক, নৃত্য শিক্ষক ও যাত্রাদলের ম্যানেজার ছিলেন। পাহাড়ী চিকিৎসক হিসাবে তাঁর সুনাম থাকলেও রীতিমতো পুঁথি পত্র নিয়েও ব্যস্ত থাকতেন। বয়স জিজ্ঞেস করে জানতে পারলাম ১৯০৪ ইং সনে তাঁর জন্ম। অর্থাৎ উক্ত সময়ে তার বয়স ৯১ বৎসর। স্মরণশক্তি, দৃষ্টিশক্তি তেমন হ্রাস পায়নি। চলতে ফিরতে কষ্ট হয়না। তিনি চারজন চাকমা রাজা দেখেছিলেন, মিজিলিক দেখেছিলেন এবং তাদের কবলে একবার পড়েছিলেন বলে ব্যক্ত করেন। তিনি বলেন, মিজিলিকদের নিষ্ঠুর বিভীষিকা শুধুমাত্র চাকমা সার্কেল ও মং সার্কেল এই দুই সার্কেলে অধিক পরিলক্ষিত হয়েছিলো। রোগ, শোক, দশা, দুর্বিপাক ও অপমৃত্যু থেকে মুক্তি লাভ করা এবং শান্তি, নিরাপদ, বৈভব সম্পত্তি লাভ, দীর্ঘায়ু আর দেব-দেবীর তুষ্টির জন্য জ্যান্ত মানুষ যুপকাষ্ঠে মাথা বসিয়ে ধারালো দা দিয়ে এক কোপে দুই ভাগ করতো। ওরা নদীতে বা জঙ্গলের বড় গাছের গোড়ায় ছোট একটি বেদী নির্মাণ করে তার উপর একখণ্ড ভিজা মাটি দিয়ে 'মাই' নামে বাঁশে চেচা কঞ্চি বসিয়ে দিতো। দুটি বাঁশে পাতা দিয়ে পূজার দেবতার সম্মতির জন্য মন্ত্রপাঠ করতো। এরপর জোড়া অথবা একজন মানুষের খণ্ডিত গলার তাজা রক্ত দিয়ে বেদী সিঞ্চিত করে মানসকর্ম সমাধা করা হতো উৎফুল্ল চিত্তে।

মিজিলিক নামে নেশাধারী বা পেশাধারী লোকেরা একসাথে দুই চারজন করে গ্রামের আশেপাশে, বাজারে বা রাস্তার ধারে ছদ্মবেশে ঘুরাফেরা করতো। ছোট ছেলে-মেয়েদেরকে খাবার জিনিস দেখিয়ে বা বিভিন্ন প্রলোভন দেখিয়ে অথবা জোর পূর্বক ধরে হাত-পা বেঁধে মুখে কাপড় বেঁধে বস্তায় বা কাল্লঙে ভরে নিয়ে যেতো। বিশেষ করে পার্বত্য চট্টগ্রামে নয়া পরঙীদের অর্থাৎ যারা চট্টগ্রামের দক্ষিণ দিক থেকে এই জেলায় নতুন বসবাসের জন্য আগমনকারীদের উপর মিজিলিকরা উপদ্রপ ঘটিয়েছিলো বলে জানা যায়। ওরা শুধু মানুষ অপহরণ নয়, বহু পরিবারকে হত্যা করে টাকা গহনা লুটপাত করে নিয়ে যেতো। টাকার বিনিময়ে সুস্থ্য সবল ছেলে-মেয়ে স্বজাতির প্রভাবশালীরা মিজিলিকদের নিকট থেকে কিনে নিতো এবং একইভাবে বধ করে মানসকর্ম পূর্ণ করতো।

খেতাবী প্রভাবশালীগণের দাপট

দাস প্রথা ঃ

অতীতে হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে ব্রাহ্মণের পরিচ্ছদে থুতু নিক্ষেপ করার জন্য শুদ্রকে অঙ্গচ্ছেদ করে শাস্তি দেয়া হতো। শুদ্র বৈশ্য এমন অস্পৃশ্যরা হাট বাজারে, মেলায় যেতে পারতো না। কোন খাদ্য দ্রব্যের উপর ওদের স্পর্শ হলে সেসব খেতো না এমনকি তাদেরকে দেখাও পাপ মনে করা হতো। আইন বিধানের দোহাই দিয়ে প্রবল শক্তিমান দুর্বলের উপর যে অত্যাচার হয়ে গেছে এটি তার একটি নজীর। পার্বত্য চট্টগ্রামের খেতাবী প্রভাবশালীরা প্রজাদেরকে দাস হিসাবে ব্যবহার করতে বা জোরপূর্বক খাটানো কিংবা শাস্তি দেয়া এমন দাপট এককালে ছিলো।

চট্টগ্রাম জেলায় অতীতে দাস প্রথা ছিলো বলে জানা যায়। এ বিষয়ে ১৭৭৪ ইং ১লা সেপ্টেম্বর চট্টগ্রামের বৃটিশ প্রতিনিধি কলিকাতার কাউন্সিলের সভাপতি মাননীয় ওয়ারেন্ট হেস্টিংস এর কাছে এক পত্র লিখেন। দাস ক্রয়, দাসের উপর প্রভূ বা মালিকের অখিকার, ক্রীতদাস সম্পর্কে যে রীতি বা নিয়ম রয়েছে তা চিঠির সংক্ষিপ্ত বিবরণ এইরূপ ঃ 'যদি এমন কেউ থাকে যে অনাথ, যার কোন আত্মীয় নেই, জমিদার,' প্রতিনিধি বা রাজস্ব সংগ্রাহক বা সম্পন্ন কোন চাষীর সাথে আত্মীয়তা সম্পর্ক নেই, যে একেবারেই নিঃস্ব, জীবন ধারনের বা জীবিকা অর্জনের যার কোন উপায় নেই, অর্থের (তার চাহিদা মতে) বিনিময়ে সেই ব্যক্তিই কেবল দাস হতে পারে। কর্ণেল ফয়ার, এশিয়াটিক সোসাইটি জার্নাল নং-১১৭ এর ৭০১ পৃষ্ঠা।

খেতাব ঃ

বৃটিশ শাসন আধিপত্য বিস্তারের আগে থেকেই চট্টগ্রাম অঞ্চল বিভিন্ন জাতি সমূহ দ্বন্দ্বে লিপ্ত ছিলো। বিশেষ করে আরাকানী, মুগল ও পর্তুগীজ সবাই চট্টগ্রাম এমনকি পার্বত্য অঞ্চলের উপরও প্রভূত্ব করেছে এবং কর্তৃত্বের ছাপ রেখেছে। ১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দে ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী দিল্লীর সম্রাট থেকে বাংলা বিহার উড়িষ্যার 'দিওয়ানী' লাভ করে। এই খেতাব থেকে পরবর্তীকালে পূর্ব বাংলায় শাসন কাজের সুবিধার্থে রাজস্ব বিশারদ এমন ব্যক্তিকে দিওয়ানী/দেওয়ানী বা দেওয়ান (রাজস্ব সম্পর্কিত ক্ষমতার কর্মচারী) নিযুক্ত করা হয়। চট্টগ্রামের ইতিহাস থেকে জানা যায় শুকদেবের শাসনামলে প্রভাবশালী সম্ভ্রান্ত লোকদের এই খেতাব প্রদান করা হয়েছিলো। যাইহোক পার্বত্য চট্টগ্রামের সকল প্রজাদের উপর যারা নেতৃত্ব করেছিলেন তারা সবাই তালুকদার, দেওয়ান, হেডম্যান, রোয়াজা, আমু, কার্বারী ও খীসা এমন খেতাব রাজ দরবার থেকে স্বীকৃতি প্রাপ্ত ছিলেন।

প্রজাদের উপর আইন জারী

খেতাব লাভের পর পার্বত্য চট্টগ্রামের শাসন ক্ষমতা ও আইন নিজ হাতে তুলে প্রজাগণের উপর নিম্নে বর্ণিত বিধিবিধান প্রচলন করে ছিলেন। যেমন ঃ-

১. প্রজারা চৌচালা বাড়ী নির্মাণ, দোধারা তজ্জা বেড়ার বাড়ী নির্মাণ ও বাড়ীতে চেয়ার রাখা নিষিদ্ধ ছিলো।

২. গ্রামের কর্তাবাবুর বাড়ীর চেয়ে উঁচু ভিটায় প্রজারা ঘর নির্মাণ, বড় বা একটি পরিবার একাধিক গৃহ কিংবা টিনের ছাউনী বাড়ী তৈরি নিষিদ্ধ।

৩. কোন প্রজা যদি কর্তাবাবুর বাড়ীতে প্রবেশ করে তাহলে সমস্ত বাড়ীটা অশুচি বা অমঙ্গল বিবেচিত হয়ে প্রজাকে এক্ষেত্রে অর্থদণ্ড ছাড়াও সোনা, রূপা, চন্দন, ঘিলা-কচোই ও হলুদের পানি ছিটিয়ে ঘর পবিত্র করা হতো।

৪. প্রজাগণের মধ্যে জুতা বা খরম দেয়া, হাঁটুর নিচে ধুতি বা গামছা পরা, মাথায় পাগড়ী বাধা, পকেটে কলম রাখা ও স্বর্ণ ধারণ করা কোন অবস্থায় যদি কর্তাবাবুর চোখে ধরা পড়ে তাহলে সাথে সাথে অর্থদণ্ড ছাড়াও শাস্তি ভোগ করতে হবে।

৫. স্বর্ণ, রৌপ্য গয়না ক্রয়, পূজা অনুষ্ঠান মেলা মেজবান করা অনুমতি ব্যতিরেকে দণ্ডনীয় অপরাধ হতো।

৬. কর্তাবাবুর বাড়ীর সম্মুখের রাস্তায় যাতায়াতের সময় গান করা, শিস দেয়া বা উচ্চ কণ্ঠে কথা বলার সাথে সাথে জরিমানা দিতে বাধ্য থাকবে।

৭. কর্তাবাবুর ব্যবহৃত পানির কুত্তি, মদের কাপ, খাবার থালা অন্যরা ব্যবহার করেছে জানলে লাঠি থাপ্পর খাওয়া ছাড়াও জরিমানা দিতে হয়।

৮. বৎসরের যে কোন দিন নিজ খোরাকী খেয়ে কর্তাবাবুর কাজ করে দেয়ার বিধান ছিলো। অপরাগতায় ততোদিন মজুরী সমান অর্থ দেয়া হতো।

৯. সাধারণ পরিবারের বা তফসিল ভূক্ত পরিবারের ছেলে-মেয়ে লিখাপড়াও শিখতে বাধা ছিলো। অর্থদণ্ড ও সেলামী দিয়ে পড়ালেখা করার অনুমতি পাওয়া গেলেও খেতাবধারী সন্তানের সাথে একই কক্ষে কিংবা একই বেঞ্চে বসতে পারতো না, নিচে বসতে হতো।

১০. ধর্মীয় কিংবা সামাজিক অনুষ্ঠানে প্রজাগণ অংশ গ্রহণের আগে জাতি বংশ গোত্র পরিচয় নেয়া হতো। কর্তাবাবুদের বাড়ীতে খানা মেজবানের সময় সাধারণ প্রজাদেরকে খেতে দেয়া হয় উঠানের দিকে।

১১. পল্লান অর্থাৎ শিকারী তার শিকারে পাওয়া হরিণ বা শুকরের পুরো একটি তাজা রান (উরু) অবশ্যই কর্তাবাবুকে পৌঁছে দিতে হতো। অন্যথায় আইন অমান্যকারী ও অসম্মানজনক কার্যকলাপের জন্য অর্থদণ্ডসহ এলাকা ত্যাগের নির্দেশ দেয়া হতো।

১২. মোরগ, মদ, শুকনা মাংস, ছড়ার ইচা মাছ, হাতের তৈরী কাপড়, দৈ-দুধ, বিনি চাউল, জুমের শাক-সবজী, ফল-মূল এ ধরনের ভেট সাথে না নিয়ে কর্তার সাথে সাক্ষাৎ করতে গেলে চরম অপদস্থ হওয়া ছাড়া মুক্তি ছিলো না।

১৩. প্রজা হিসাবে প্রতি বছর নজরানা স্বরূপ কর্তাবাবুকে কয়েক সের জুমিয়া সুগন্ধযুক্ত চাউল, ডলুবাঁশের বড় এক চুংগা মদ, ডাক দেয় এমন একটা মোরগ প্রত্যেক পরিবারকে অবশ্যই দেয়ার নির্দেশ ছিলো। তবে রোগী বিধবা বা বিপত্নীক, পঙ্গু, দরিদ্র তাদের জন্য প্রযোজ্য নহে।

১৪. বিবাহ সাদীর ব্যাপারে কঠিনভাবে বাধা-ধরার নির্দেশ ছিলো। যেমন- প্রজার পুত্র খেতাবধারীর বংশের কন্যা বিবাহ করতে বা মেলামেশা করতে কোন মতেই পারতো না। খেতাবধারীর পুত্র ইচ্ছা করলে প্রজা পরিবারের কন্যা বিনা শর্তে বিবাহ করতে পারতো। এমনকি অবৈধ কাজে ধরা পড়লে কোন বিচার হতো না। খেতাবধারীর পুত্র যদি খেতাবধারী নহে এমন প্রজা পরিবারের কন্যা বিবাহ করে তাহলে জামাতা ও বেয়াই এরইজ্জত রক্ষার্থে কন্যার পিতাকে অবশ্যই রাজ দরবারে গিয়ে উপযুক্ত নজরানা দিয়ে খেতাব নিতে হতো।

১৫. খেতাবধারীগণের একাধিক স্ত্রী রাখার প্রচলন ছিলো। এরপরও তাদের উপপত্নী থাকতো। প্রভাবশালীগণ ইচ্ছাধীন যৌন সম্ভোগ, তাদের ঔরসে সাধারণ প্রজার কন্যা গর্ভধারণ, বিবাহিতা স্ত্রীকে বিবাহ করা বা ধর্ষন করতে যে প্রতিবাদ কিংবা অভিযোগ ছিলো না। যদি হয়ে থাকে তাহলে প্রকাশ্যে তার ঘর জ্বালিয়ে বিতাড়িত করা হতো।

১৬. খাজানা আদায়ের কিংবা গ্রাম্য সালিশের জন্য কর্তাবাবুগণ নিজে না গিয়ে পাঠিয়ে দিতেন তার ব্যবহৃত লম্বা গলাক্ বেতের লাঠি।

১৭. আইন অমান্যকারী বা বিচারে দোষী সাব্যস্ত ব্যক্তিকে অর্থদণ্ড ছাড়াও বগাকল দিয়ে নির্যাতন করা হতো।

সামাজিক আইনের ঐ সময় প্রধান বিচার কার্য্যালয় ছিলো একমাত্র রাজ দরবার।

রাউলী পুরোহিত ও ধর্ম

লুরী/রোলী বা রাউলী নামের ধর্মীয় পুরোহিতগণ এককালে চাকমা ও বড়ুয়া জাতির অতি সমাদৃত ছিলেন। বড়ুয়া জাতির মধ্যে যখন বৌদ্ধ শাস্ত্রে সুপণ্ডিত ও দর্শন জ্ঞান সম্পন্ন ভিক্ষু আবির্ভাব হন তখন পরিশুদ্ধ হয় চট্টগ্রামের বৌদ্ধ ধর্ম। দিকপাল ভিক্ষুগণ দেশে এবং দেশের বাইরে ধর্ম চর্চা, গবেষণা করে জ্ঞান আহরণ করেন। তাঁরা গ্রন্থে, প্রচারে ও সেবায় বৌদ্ধ ধর্মের সঠিক পথ দেখিয়ে দিলেন। অতঃপর তাদের মধ্যে লুরী

বা রাউলীর সমাদর কমে যেতে থাকে। অনুরূপভাবে চাকমা সম্প্রদায়ের মধ্যে বহু লুরী গ্রামাঞ্চলে দেখা গিয়েছে এবং তাদেরকে দিয়ে ধর্মীয় কার্য সম্পাদন করা হতো। শ্রীমৎ অগ্রবংশ স্থবির রাঙামাটিতে রাজগুরু পদে অধিষ্ঠিত হবার পর লুরী সম্প্রদায়গণ ক্ষিপ্ত হয়ে যান। এমন কি তাদের অনুচরগণও বিভিন্ন পুণ্য কর্মাদিতে বাধা সৃষ্টি করতে থাকেন। তাঁরই দীর্ঘ দিনের প্রচেষ্টায় লুরী জন গোষ্ঠী ক্রমে ক্রমে ক্ষীণ হয়ে যায়। তবে মগ ও তঞ্চঙ্গ্যা সম্প্রদায়ের মধ্যে কোন ব্যক্তি লুরী ধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করেননি। বড়ুয়া জাতির মহাপণ্ডিত শীলচার শাস্ত্রী মহোদয় তার 'থেরবাদ বৌদ্ধধর্ম' গ্রন্থ থেকে জানা যায় বৌদ্ধধর্ম বিদ্বেষী শংকরাচার্যের বদরিকাশ্রমে রোলী/রাউলীকে পূজারী বলা হতো। বড়ুয়া সমাজে মদরারাউলী, খান রাউলী, ধমারাউলী, খুদ্যা রাউলী এবং চাঁন রাউলী নামের পাঁচ সম্প্রদায়ের গোষ্ঠী বা বংশ পরস্পর এখনো রয়েছে। সাহিত্যিক বিমলেন্দু বড়ুয়া মহোদয়ের সার্বিক তত্ত্বাবধানে প্রকাশিত 'বাংলাদেশ বৌদ্ধ ধর্মে মহাস্থবিরের অবদান' গ্রন্থে দেখা যায় শ্রীমৎ প্রিয়ানন্দ মহাস্থবির দর্শন সাগর, মহানায়ক এস ধর্মপাল মহাস্থবির, শ্রীমৎ বিশুদ্ধানন্দ মহাথেরো এঁদের ভূমিকায় রাউলী শব্দের বুৎপত্তি প্রদর্শন করেন। এতে বলা হয় রাউলী শব্দটি এসেছে আউলিয়া শব্দ থেকে। মুসলমানরা তাদের ধর্মপ্রচারকগণকে আউলিয়া সম্বোধন করতেন।

চট্টগ্রামের রাজা নগর বিহারের অধ্যক্ষ ও বহু গ্রন্থ প্রণেতা রাজগুরু শ্রীমৎ ধর্মরত্ন মহাস্থবির বিদ্যাবিনোদ (১৯৬৭) মহোদয়ের মতে মগের অত্যাচারে পালিয়ে আসা বহু আনক (চাকমা) আরাকান থেকে চট্টগ্রামাভিমুখে পালিয়ে আসতে শুরু করেন। তাদের মধ্যে অধিকাংশই পরিবার রাউলী উজান (রাউজন), বিনাঝিরি (বিনাজুরী), রান্যা/রাউন্যা/রাঙ্গুন্যা (রাঙ্গুনিয়া) নামক স্থানে স্বজাতির সান্নিধ্যে বসবাস শুরু করেন।আরাকান থেকে পালিয়ে আসার সময় তাদের মধ্যে অনেকেই বৌদ্ধ শ্রমণ বেশ ধারণ করেছিলেন। কেননা মুণ্ডিত মস্তক, লাল কাপড় পরিধানরত এমন ব্যক্তিকে মগেরা তাদের ধর্মগুরু মনে করে হত্যা করতো না। ছদ্মবেশী ওরা পরবর্তীকালে চাকমা ও বড়ুয়া জাতির মধ্যে একমাত্র ধর্মীয় পুরোহিত হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে। তিনি আরো উল্লেখ করেন- সাধারণত এরা অশিক্ষিত ও দারিদ্রতার কারণে লুরী হয়ে জীবন যাপন করতেন।

আমার চাকুরী জীবেন বহু বছর যাবৎ পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রত্যন্ত অঞ্চল ভ্রমণ করেছি, বিভিন্ন গ্রামে গিয়ে বিভিন্ন লোকের বাড়ীতে আপ্যায়িত হয়েছি। কিছু কিছু চাকমাদের গ্রামে রাউলী বা লুরী দেখেছি, তাদের সাথে ধর্মীয় ও সামাজিক বিষয় নিয়ে বহু আলাপ করেছি। গ্রামাঞ্চলে এখনও লুরী দেখা যায়। সাধারণত তাঁরা গ্রামেই বাস করেন। একজন লুরী পুরোহিতকে স্ত্রী পুত্র কন্যা সহ একই গৃহে দেখেছি। তবে গ্রামের ভেতর ছোট একটি গৃহ নির্মাণ করে এককভাবে বা শিষ্যসহ থাকতে দেখেছি দুইজন ধর্মীয় লুরী পুরোহিতকে। যে কোন সময়ে যে কোন বয়সে এমন কি স্ত্রী, পুত্র, কন্যা থাকলেও লুরী হওয়া যায়। বাজার থেকে কেনা লাল রং কাপড় বা কাঁচা হলুদ পিষিয়ে

তাতে চুন মিশিয়ে লাল রং তৈরী করে। দৈর্ঘ্য ৪/৫ হাত, প্রস্থ ১ হাত সাদা কাপড় সেই রঙে ডুবিয়ে তাদের পরিধানের রং বস্ত্র হিসেবে দুই টুকরো ব্যবহার করতেন। শরীরে থাকতো বামহাত্যা অর্থাৎ বাম কাঁধ থেকে ডান হাতের বগল পর্যন্ত অর্ধ বেষ্টন। আর নিচে গুচ দিয়ে গামছার মতো পড়তেন সেই খণ্ড কাপড়। মুণ্ডিত মস্তক, গলায় মাতৃগুলা (রুদ্রাক্ষ) বীজের মালা এবং বাহুতে লাপ্পোই বা তাবিজ দেখা যেতো। কাধে ঝুলানো একটি থলে বা পুতলী।

বড়শী বাইতে, পরের গরু চড়াতে বা দিন মজুরী করতে, মদের আড্ডায়ও লুরী দেখেছি। ১৯৭৩ সনে কাট্টলী মৌজার জনৈক বুড়ালুজ্যা অর্থাৎ বুড়োলুরীর সাথে সাক্ষাত করি। তিনি বয়সে প্রবীন। এলাকার লোকেরা তাঁকে শীলবান ও জ্ঞানী মনে করতেন। তাঁর সাথে আলাপ করে জানতে পারলাম, লুরী সম্প্রদায়গণ অতি প্রাচীন। তারা বুদ্ধের পুত্র রাহুলের উত্তরসূরী বংশধর এবং বৌদ্ধ ভিক্ষুর চেয়ে জ্যেষ্ঠতায় ও শীল ভাবনায় অনেক বড়। লুরী দ্বারা চাংফী, মাংফী, উইফী, চিগিরা ফী, পেজা ফী, বিয়ালা ফী, মাতৃদশা, পিতৃদশা, গুরুদশা ইত্যাদি নামের ত্রিশটি ফী বা দশা নিরুপন ও নিবারণ করা হয়। ওঝা বৈদ্যদের মতো গংগা, বিয়াত্রা, ভূত, পরমেশ্বরী, আখত্যা, মোত্যা, মগনী, বড়শিল, বতকঙরী, জুর কঙরী, শিব কঙরী, বিনি কঙরী, ফুল কঙরী, ভলু কঙরী ও ক-কঙরী ইত্যাদি নামের অপদেবতার পূজায় সমর্থন দিয়ে নিমন্ত্রিত হতেন। তাদের মধ্যে গাথ্যা ও লোথক নামে দলের জ্যৈষ্ঠতা ও সম্মান নিয়ে দ্বন্দ্ব রয়েছে। শ্রীবুধ খাজংজী (?) নামের জনৈক ব্যক্তি চাকমা বর্ণমালায় "আগর তারা" প্রণয়ন করেন। অনুচারিত, নিরর্থ ও অবোধ্য এই হাতের লিখা পাণ্ডুলিপি আগর তারা লুরীগণের একমাত্র মূল ধর্মগ্রন্থ হিসেবে সমাদৃত হওয়াতে বর্তমান আগরতারা নিয়ে গবেষণা চলছে।

বৈষ্ণব-বৈষ্ণবী ও বৈরাগী এক সময় চাকমা জাতির বহু দেখা গিয়েছিলো। তাঁরা আধ্যাত্মিক গান গেয়ে গ্রামে গ্রামে বাড়ির আঙিনায় নেচে নেচে ভিক্ষা করতে দেখা গিয়েছে। এঁরা নিরামিষ ভোজী। লাল হলুদবর্ণের জামা আর একই বর্ণের লুঙ্গী পড়তেন। হাতে থাকতো একতারা। বৈষ্ণবী বৃন্দাবনের রাধা হয়ে নাচতেন। মেলায় বা পারিবারিক খানাপিনা উৎসবে বৈষ্ণব-বৈষ্ণবী ও বৈরাগী দেখা যেতো। আবার দেখা গেছে জটাধারী যোগী বা ঋষি। হাতে থাকতো লোহার ত্রিশুল। সাধারণত তাদের মধ্যে গৃহস্থের বাড়িতে প্রবেশ না করা, পবিত্রতা রক্ষা করা এবং আত্ম সংযম প্রধান বৈশিষ্ট্য। চাকমা জাতির তিনজন ঋষি স্বচক্ষে দেখেছি। তন্মধ্যে বব্রুবাহন নামে ঋষির সাথে আমার ভালো জানাশোনা ছিলো। তিনি সৎ এবং বিনয়ী ছিলেন। একজন ভালো চিকিৎসক হিসেবে তাঁর খুবই যশ ছিলো। আমার জানা মতে তিনি শ্মশানে বহুবার রাত্রি যাপন করেছিলেন।

খ্রীষ্টান ধর্মে অবগাহন

চট্টগ্রাম থেকে পার্বত্য চট্টগ্রামকে আলাদা জেলায় বিভক্ত করার পর জেলার সদর করা হয় চন্দ্রঘোনায়। সাথে সাথে ১৮৬২ ইং সালের অক্টোবর মাসে খ্রীষ্টানদের প্রচেষ্টায় প্রথম খ্রীষ্টান প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপিত করা হয়। বলা বাহুল্য পার্বত্য চট্টগ্রামে এটাই সর্ব প্রথম ও একমাত্র স্কুল। ও সময় পাহাড়ী ছেলে মেয়েদের পড়া লিখা শেখা বাধা ধরা ছিলো। সুতরাং অনেকেই খ্রীষ্টান ধর্মে দীক্ষিত হয়ে পড়া লিখা করার সুযোগ পায়। ও সময় পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ীদেরকে খ্রীষ্টান ধর্মে দীক্ষিত করার জন্য বিনামূল্যে কাপড়, আটা, বিস্কুট, ঔষধ ও ধর্মের বই এমনকি টাকাও দেয়া হতো।

এভাবে খ্রীষ্টান ধর্ম প্রচারের সার্থকতায় ১৮৮৯ খৃঃ 'যিশু সংবাদ' নামে যিশুবাণী সম্বলিত পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ী জাতিদের জন্য একটি পত্রিকা রীতিমতো প্রকাশিত হয়। বাংলা অক্ষরে ও চাকমা ভাষায় পত্রিকাটি সংখ্যা গরিষ্ট চাকমা জাতিকে খ্রীষ্টান ধর্মে দীক্ষিত করার মাধ্যম বলা যায়। এভাবে অনুসারীগণের দ্বারা চাকমা ভাষায় **'আমার প্রভূ যিশু'** নামে পুস্তিকা বের হয়। এরপর **'ধর্ম কারে কয়'** আরো একটি পুস্তিকা বের হয়। ইহা ছাড়াও ফোল্ডার, ছবি ও প্রচারপত্র প্রতিটি গ্রামে বিতরণ করে গীর্জা নির্মাণের পরামর্শ দেয়া হতো। গৌরবের বিষয়,স্বধর্ম ত্যাগ করে কোন তঞ্চঙ্গ্যা খ্রীষ্টান হয়নি।

পার্বত্য চট্টগ্রামের ভৌগলিক বিবরণ

বাংলাদেশের দক্ষিণ পূর্ব সীমান্তে দক্ষিণ প্রলম্বিত ৫০৯৩ বর্গমাইল আয়তন বিশিষ্ট এক বিস্তীর্ণ পার্বত্য অঞ্চলকে "পার্বত্য চট্টগ্রাম" বলা হয়। ১৭১৫ খৃঃ থেকে ১৭৬০ খৃঃ পর্যন্ত মোঘল শাসনামল এবং ১৭৬০ খৃঃ থেকে ১৮৬০ খৃঃ ইংরেজ শাসন পর্যন্ত এই অঞ্চল অর্থাৎ পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলটি রাজস্ব কাগজ পত্রে "কার্পাস মহল" নামে পরিচিত ছিলো। ১৮৬০ সালের ১লা আগষ্ট "রেইডস অব ফান্ড্রিয়ার ট্রাইবস এ্যাক্ট ২২ অব ১৮৬০" অনুসারে এই পার্বত্য অঞ্চলকে পার্বত্য চট্টগ্রাম নামে এক স্বতন্ত্র জেলায় রূপান্তরিত করা হয়। ক্যাপ্টেন ম্যাগরেট (Magrath) এই জেলার প্রথম সুপারিন্টেন্ডেন্ট ছিলেন। ১৮৬০ ইং সালে চট্টগ্রাম বন্দর থেকে কর্ণফুলী নদীর ২৭ মাইল উজানে চন্দ্রঘোনা (নয়া শহর) নামক স্থানে এই জেলার প্রথম প্রশাসনিক সদর দপ্তর স্থাপন করা হয়। বৃটিশ সরকার কর্তৃক উক্ত সনে ২২ নং আইনের ধারায় চট্টগ্রাম থেকে কার্পাস মহল নাম পরিবর্তন করে পার্বত্য চট্টগ্রাম নামে জেলা করেন। ১৮৬৮ সালের নভেম্বর মাসে চন্দ্রঘোনা থেকে কর্ণফুলী নদীর আরো ৩৩ মাইল উজানে এই সদর দপ্তর রাঙামাটিতে স্থানান্তর করা হয়। জেলার সীমা, উত্তরে ভারতের ত্রিপুরা

রাজ্য, দক্ষিণে বার্মার আরাকান প্রদেশ, পূর্বে ভারতের লুসাই হিল ও আরাকান প্রদেশ এবং পশ্চিমে চট্টগ্রাম জেলা ও ত্রিপুরা রাজ্য। ১৮৮১ সালে ১লা সেপ্টেম্বর বঙ্গীয় গভর্নর পার্বত্য চট্টগ্রামকে মং, বোমাং ও চাকমা সার্কেল করে তিনজন রাজা নিযুক্ত করেন।

ভারত বিভক্তির পর ১৯৪৭ সালে ১৪ই আগষ্ট পাকিস্তান আলাদা রাষ্ট্রে পরিণত হয়। ১৪ই আগষ্ট স্বাধীনতা দিবস পালিত হলেও উক্ত তারিখের দুই দিন পর অর্থাৎ ১৬ই আগষ্ট পার্বত্য চট্টগ্রামকে পাকিস্তানে অন্তর্ভূক্ত করা হয়। সেই অঞ্চলের দু'টি প্রধান প্রাকৃতিক সম্পদের উপর সরকারের দৃষ্টি পতিত হয়। একটি এর বিস্তৃত বনভূমির মূল্যবান বনজ সম্পদ গাছ-বাঁশ আহরণ করে কাগজ তৈরীর কাঁচামাল হিসাবে ব্যবহারের জন্য ১৯৫০ সালের শেষের দিকে হোয়াগ্‌গা মৌজার চন্দ্রঘোনায় একটি বৃহৎ কাগজের কল স্থাপনের কাজ শুরু হয়। ১৯৫৩ সালের ১৬ই অক্টোবর সর্ব প্রথম আমদানীকৃত কাগজের মণ্ড দিয়ে এই কর্ণফুলী কাগজের কলে কাগজ উৎপাদনের কাজ শুরু হয়। কলের কাঁচামাল আহরণের জন্য কল কর্তৃপক্ষ ৩৭০ বর্গমাইলের অধিক সংরক্ষিত বনাঞ্চল ইজারা গ্রহণ করেন।

কর্ণফুলী নদীর জল প্রবাহ থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদনের উদ্দেশ্যে ১৯৫৪ সনের দিকে প্রথমে সুবলং বাজার থেকে সামান্য নিচে চিলারধাক নামক স্থানে কর্ণফুলী নদীর বাঁধ দেয়ার ব্যবস্থা করা হয়। এখানে কিছু দিন কাজ করার পর স্থগিত রেখে পরবর্তীতে কাপ্তাই খালের মুখ মুরুংঘাট থেকে অল্প উজানে এবং রাইংখ্যং খালের মুখ থেকে মাইল দু'য়েক নিচে কাপ্তাই হাইড্রো ইলেকট্রিক প্রজেক্ট নামে কর্ণফুলী বাঁধের কাজ শুরু হয়। ৪৯ কোটি টাকা ব্যয়ে ও প্রায় পাঁচ বছর পুরোদমে কাজ চলার পর অবশেষে ১৯৫৯/৬০ ইং ১,৩০,০০০ কিলোওয়াট শক্তি সম্পন্ন বিদ্যুৎ শক্তি উৎপাদনের জন্য ২,২০০ ফুট দীর্ঘ এবং ১৩০ ফুট এম, এস, এল উচ্চতা বিশিষ্ট নির্মাণ কাজ পুরোপুরিভাবে শেষ হয়। এই বাঁধ তৈরীর ফলে কর্ণফুলী নদীর উজানে প্রাকৃতিক পরিবেশের পরিবর্তন ঘটে, বৃষ্টিপাতের তারতম্যও সৃষ্টি হয়। আবাদী জমির পরিমাণ হ্রাস পায়। স্থানীয় অধিবাসীর জীবন বোধের পরিবর্তন, পেশাবৃত্তির বৈচিত্র, মন ও মানসিক দিগন্তের বিস্তৃতি ঘটিয়ে আত্ম সচেতনা জাগিয়ে তোলে। এছাড়া ভূমি ব্যবস্থার উপরও এর ব্যাপক প্রভাব পতিত হয়।

১৯৬০ ইং কাপ্তাই বাঁধ বন্ধ করার ফলে কর্ণফুলী বড় বড় শাখা নদীগুলোর মধ্যে

রাইংখ্যং, চেংগী, সুবলং, কাচলং, মাইনী প্রভৃতি নদীর উপত্যকায় প্রায় ৮০/৯০ মাইল দীর্ঘ এবং ১ থেকে ১০ মাইল প্রশস্ত বিশাল আকৃতির কৃত্রিম হ্রদ সৃষ্টি হয়। যার ফলে এই এলাকায় প্রায় ৫৪,০০০ একর আবাদী জমি (মতান্তরে ৫৮,০০০.০০ একর) হ্রদের জলের নিচে ডুবে যায়। ১০৩ টি মৌজার ২৫৬ বর্গমাইল এলাকা হ্রদের জলে ক্ষতিগ্রস্ত হলে এই সব এলাকা থেকে লক্ষাধিক উদ্বাস্তু অন্যত্র পুনর্বাসন করতে হয়েছিলো। প্রায় ৪০,০০০ হাজার উদ্বাস্তুকে কাচলং সংরক্ষিত বনাঞ্চলের একটি সমতল অংশ উন্মুক্ত করে পুনর্বাসন করা হয়। এদের মধ্যে শতকরা পঁচানব্বই জন পাহাড়ী অবশিষ্ট পুরান বস্তী বাঙ্গালী।

কাপ্তাই বাঁধের কবলে এই অঞ্চলের স্থায়ী বসবাসরত পাহাড়ীগণ তাদের পূর্ব পুরুষের ভিটা মাটি পরিত্যাগ করে ছড়িয়ে ছিটিয়ে অন্যত্র চলে যেতে বাধ্য হয়েছিলো। রাইংখ্যং এলাকার ক্ষতিগ্রস্ত উদ্বাস্তু তঞ্চঙ্গ্যারা রাজস্থলী, বান্দরবান, রোয়াংছড়ি, আদিকদম ছাড়াও ভারতের সীমান্ত পাড়ে ও আরাকানে চলে যায়। অধিকাংশ তঞ্চঙ্গ্যঅ রাইংখ্যং সংরক্ষিত বনাঞ্চলের অধীনে আশ্রয় গ্রহণ কিংবা জলমগ্ন এলাকার উঁচু পাহাড়ে কঠিন জীবন যুদ্ধ করে বেঁচে রয়েছে। এতে বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির ভেতর আর্থিক, শিক্ষা সর্বোপরি নিজস্ব কৃষ্টি সংস্কৃতির মারাত্মক হুমকীর সম্মুখীন হয়।

এই অঞ্চলের পার্বত্য জনগোষ্ঠির অর্থনৈতিক পুনর্বাসনের জন্য বিভিন্ন উপায়ে চাষোপযোগী করা যেতে পারে এমন উঁচু জমির ব্যবহারের প্রকল্পের কাজ হাতে নেয়া হয়। প্রকল্পের জন্যে কলম্বো প্লানের অধীনে ১৯৬৩-৬৪ সালে কানাডার বন বিশেষজ্ঞ দল FOREST VANCUVER কে এই অঞ্চলের ভূমি এবং প্রাকৃতিক সম্পদ জরীপের কাজ সমাপ্ত করে পরবর্তী মাসে সরকারের নিকট প্রতিবেদন পেশ করেন। এ প্রতিবেদন অনুসারে দেখা যায় সর্বমোট ২৩,৫৯,৯১৩ একর ভূমি জরীপ করা হয়। তন্মধ্যে (ক) "এ" শ্রেণী ৭৬,৪৬৬ একর জমিতে সকল প্রকার ফসল করা যেতে পারে। (খ) "বি" শ্রেণীর ৬৭.৮৭১ একর জমিতে যার (শতকরা ৬০% পাহাড়ের পাদদেশ এবং ৪% ঢালু জমি) ধাপ কেটে চাষ করা যেতে পারে। (গ) "সি" শ্রেণীর ৩২,০২৪ একর পাহাড়ের চূড়ায় জমিতে গভীর ধাপ কেটে চাষোপযোগী করা যেতে পারে। অবশিষ্ট "ডি" শ্রেণীর ১৮,১৬,৯৩০ একর জমিতে চাষ করা যাবেনা। তবে বন সৃষ্টি করা যেতে পারে।

প্রতিবেদনের উপর ভিত্তি করে ১৯৬৭-৬৮ সালে **E.P.A.D.C (ইষ্ট পাকিস্তান এগ্রিকালচার ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন)** অর্থাৎ পূর্ব পাকিস্তান কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন) নামে প্রাথমিকভাবে এই অঞ্চলের মোট ৬৯ টি মৌজায় ৫,৭০,৩১০ একর বন্দোবস্তীর ব্যবস্থা করা হয়। ১৯৭১ সালে দেশ স্বাধীন হবার পর **"বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন সংস্থা"**

হয়ে যায়। এরপর "উদ্যান উন্নয়ন বোর্ড" হয়ে যাবার পর পুনরায় **"কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর"** হয়। যাইহোক এ প্রকল্পের অধীনে ১৯৬৯-৭৪ সাল পর্যন্ত প্রত্যেক পরিবারকে ৬ (ছয়) একর পাহাড় (উচ্চ ভূমি) বন্দোবস্তীসহ জমি, নগদ অর্থ প্রদান, চারা, বীজ ও সার বিতরন করা হয়। এভাবে প্রতিটি বাগানকারীদের উপযুক্ত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে প্রতিটি মৌজায় একজন করে দক্ষ মৌজা কৃষি সহকারী (পরবর্তীতে ব্লক সুপার ভাইজার বি,এস) নিযুক্ত করা হয়। এই প্রকল্প হবার পর পার্বত্য অঞ্চলে আনারস, কলা, কাঠাল, আম, সফেদা, কাজু বাদাম, কুল, নারিকেল, লিচু, পেয়ারা, কমলা, লেবু, শাকসবজী প্রচুর উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। কিন্তু কৃষকেরা বাজারে ন্যায্য মূল্যের অভাবে হয়রানি ভোগ করে আসছে।

পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলার বিভক্তি

১৯৮০ সালের ৪ঠা মে তারিখে অনুষ্ঠিত পার্বত্য চট্টগ্রামের উন্নয়ন সংক্রান্ত কাউন্সিল কমিটির বৈঠকে পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলাকে তিনটি নতুন জেলায় বিভক্ত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। এই সিদ্ধান্ত অনুসারে ১৯৮১ সালের ৪ঠা এপ্রিল এই জেলার দক্ষিণাঞ্চলের বান্দরবান, রুমা, লামা, নাক্ষ্যংছড়ি, আলিকদম, থানচি ও রোয়াংছড়ি এই সাতটি থানা গঠন করে পরবর্তী মে মাস থেকে জেলার কাজ শুরু হয়। ১৯৮৩ সালের ১০ই অক্টোবর উত্তরাঞ্চলের রামগড়, খাগড়াছড়ি, মাটিরাংগা, পানছড়ি, দীঘিনালা, মানিকছড়ি, লক্ষীছড়ি ও মহালছড়ি এই আটটি থানা করে খাগড়াছড়ি জেলা করা হয় এবং ৭ই নভেম্বর তারিখে উদ্বোধন করা হয়। রাঙামাটি জেলায় দশটি থানা গুলোর নাম হলো রাঙামাটি সদর, কাপ্তাই, রাজস্থলী, বিলাইছড়ি, জুরছড়ি, বরকল, লংগদু, বাঘাইছড়ি, নানিয়ার চর ও কাউখালী। বৃহত্তর পার্বত্য চট্টগ্রামের ২৫টি থানা এবং ৩৮৬ টি মৌজা রয়েছে।

পার্বত্য সংকট পর্যালোচনা

১৯৭১ ইং দেশ স্বাধীন হয়। ১৯৭৩ সালের সাধারণ নির্বাচনের সময় রাঙামাটি পুরাতন কোর্ট বিল্ডিং ময়দানে বিশাল জনসভায় রাষ্ট্রনায়ক শেখ মুজিবুর রহমান পাহাড়ীদের উদ্দেশ্যে বলেন, "বাংলাদেশের জনগণ সবাই বাঙ্গালী, দেশের সকল জাতি বাঙ্গালী। সে যে জাতি হোক না কেন বাংলাদেশে যে কোন জেলায় বসবাস করতে পারবে-।" তিনি চাকমা রাজা ত্রিদিব রায়ের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা বিরোধী ভূমিকা

পালনের অভিযোগ আনেন, তাঁর নাগরিকত্ব বাতিল এবং সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করেন। মহান নেতার এই উক্তিতে পাশে উপবিষ্ট রাজমাতা বিনীতা রায়ের দু'চোখ সজল হয়ে উঠে। ফলে সামন্তবাদী রাজনীতির বিপরীতে উত্থান ঘটে মার্কসবাদী এবং জাতীয়তাবাদী রাজনীতির। মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা জুম্মোয়া জাতীয়তাবাদের শ্লোগান তুলে উপজাতীয়দের এক কাতারে নিয়ে আসেন এবং পরবর্তীকালে পার্বত্য চট্টগ্রামের অবিসংবাদিত নেতা হিসাবে তিনি নিজকে প্রতিষ্ঠিত করেন।

আওয়ামী লীগের আমলে বেসামরিকভাবে ব্যাপক বহিরাগতের পুনর্বাসন কাজ শুরু হয়। পার্বত্য চট্টগ্রামের বান্দরবান জেলা রুমা এবং খাগড়াছড়ি জেলার দীঘিনালা এই দুটি স্থানে সর্ব প্রথম শক্তিশালী সেনানিবাস স্থাপনের ব্যবস্থা করেন। ১৯৭৫ সালে ১৫ই আগষ্ট বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সপরিবারে নিহত হন।

জিয়াউর রহমান ক্ষমতায় এলেন। ১৯৭৬ সালের ২০ অক্টোবর রাষ্ট্রপতি জিয়ার **'পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড'** গঠন একটি যুগান্তকারী ঘটনা (যদিও তার প্রশাসনিক কাঠামো জন্ম লগ্ন থেকেই বিতর্কিত এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড সামরিক বাহিনীর কর্তৃত্বাধীন)। ১৯৭৭ সালে উপজাতীয়দের দাবীর প্রেক্ষিতে **'উপজাতীয় সাংস্কৃতিক ইনষ্টিটিউট'** গঠনও ছিলো সে সরকারের ইতিবাচক পদক্ষেপ। ১৯৭৯ সালে পার্বত্য চট্টগ্রামের বাঙ্গালী জনসংখ্যা অসম বৃদ্ধি, জোর পূর্বক পুনর্বাসন দেয়ার সফল হয়। ১৯৮১ সালে চট্টগ্রামে সামরিক বাহিনীর বিদ্রোহে বি, এন, পি, নেতা জিয়াউর রহমান নিহত হন।

জাতীয় পার্টির নেতা হুসেন মুহাম্মদ এরশাদ ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন। তিনিও জিয়া সরকারের মতো পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যাকে অর্থনৈতিক সমস্যায় রূপ দিলেন। তিনি পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যা নিরসনে ১৫ই সেপ্টেম্বর ১৯৮৮ সনে উপজাতীয় নেতৃবৃন্দের সাথে জাতীয় কমিটির মাধ্যমে চুক্তি করেন। তিনি শান্তি বাহিনীর অস্ত্র সমর্পন সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করে দিলেন। রাজনৈতিক সমস্যাকে মোড় ঘুরিয়ে রাঙামাটি, বান্দরবান ও খাগড়াছড়ি এই তিন জেলা সমূহের জন্য বিশেষ ক্ষমতা সম্পন্ন পরিষদ গঠন করার ব্যবস্থা করলেন। প্রস্তাবিত এই জেলা পরিষদের (**স্থানীয় সরকার পরিষদ / পার্বত্য জেলা পরিষদ**) জনসংখ্যা নির্বিশেষে সকল উপজাতীয় প্রতিনিধি থাকবে। সর্বোপরি জেলা পরিষদে তিন জেলায় তিনজন চেয়ারম্যান উপজাতীয় লোক নির্বাচিত হবেন। ১৯৮৯ সালের ২৫শে জুন এক প্রহসন মূলক নির্বাচনের মাধ্যমে এরশাদ সরকার পার্বত্য অঞ্চলে স্থানীয় সরকার পরিষদ কায়েম করেন।

৩১ সদস্য বিশিষ্ট পরিষদের উপজাতি এবং অউপজাতির আসন নিম্নরূপ ঃ

		রাঙামাটি	বান্দরবান	খাগড়াছড়ি	মোট
ক) চেয়ারম্যান		১	১	১	৩ জন
খ) চাকমা	সদস্য	১০	১	৯	২০ জন
গ) মগ (মারমা)	”	৪	১০	৬	২০ জন
ঘ) তঞ্চঙ্গ্যা	”	২	১	০	৩ জন
ঙ) ত্রিপুরা + উচোই	”	১	১	৬	৮ জন
চ) চাক	”	০	১	০	১ জন
ছ) লুসাই	”	১	১	০	২ জন
জ) পাংখু বোম	”	০	০	০	১ জন
ঝ) খেয়াং	”	১	০	০	১ জন
ঞ) খুমি	”	০	১	০	১ জন
ট) বাঙ্গালী	”	১০	১১	৯	৩০ জন
ঠ) মুরং (ম্রো)	”	১	৩	০	৪ জন
		৩১	৩০	৩০	৯১ জন

এরশাদ সরকারকে স্বৈরাচারী আখ্যায়িত করে গণমুক্তি আন্দোলনের মাধ্যমে পতন ঘটিয়ে বি. এন. পি পুর্নবার ক্ষমতায় ফিরে আসে এবং বেগম খালেদা জিয়া প্রধান মন্ত্রী হন। সাপ্তাহিক ‘আনন্দ পত্র’ মতে জানা যায় ১৯৭৯ সনে জিয়াউর রহমান ৩০,০০০ হাজার বাঙ্গালী পরিবারকে প্রাথমিকভাবে পার্বত্য চট্টগ্রামে পুনর্বাসনের সার্থকতায় ৬৫ কোটি টাকা এতে বরাদ্দ দেন। এভাবে ১৯৮২ সালে পার্বত্য চট্টগ্রামে পুনর্বাসিত বাঙ্গালীর জনসংখ্যা ৪ লক্ষের মতো বৃদ্ধি পায়। এর ফলে এরশাদ শাসন থেকে খালেদা শাসন পর্যন্ত পার্বত্য চট্টগ্রামে হত্যা, অগ্নি সংযোগ, লুটপাট, ধর্ষন, অপহরণ ইত্যাদির ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে তিন শতাধিক নিখোঁজ প্রায় ৫০ হাজার শরণার্থী ভারতের ত্রিপুরায় ও মিজোরামে চলে যেতে বাধ্য হয়। ১৯৯৬ সালে নির্বাচনে বি. এন. পি. নেত্রী খালেদা জিয়া পরাজিত হলেন আওয়ামী লীগের নেত্রী শেখ হাসিনার নিকট।

শেখ হাসিনা ক্ষমতা অধিকারের পর পার্বত্য চট্টগ্রামের বিরাজমান পরিস্থিতি শিথিল হয়ে আসে। তবে জনসংহতি সমিতির সংশোধিত পাঁচ দফা দাবিনামা তার সরকার মেনে নিতে সম্মত হয়েছেন বলে। সরকার পাঁচ দফা দাবিনামাকে সম্মতি প্রদান ও পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ গঠনের সিদ্ধান্তে ২রা ডিসেম্বর ১৯৯৭ ইং জনসংহতি সমিতি তথা শান্তিবাহিনীর চেয়ারম্যান শ্রীজ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা ওরফে সন্তু লারমা এর সাথে বাংলাদেশ সরকারের মাননীয়া প্রধান মন্ত্রী শেখ হাসিনার শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। অতঃপর খাগড়াছড়ি ষ্টেডিয়ামে ১০ই ডিসেম্বর ১৯৯৭ইং সনে জনসংহতি সমিতির সদস্যবৃন্দের এক অভূতপূর্ব অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এবং লক্ষাধিক লোকের উপস্থিতিতে অস্ত্র সমর্পন করেন।

৮ই এপ্রিল ১৯৯৫ ইং বান্দরবান সদর থানাধীন বালাঘাটা উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে "বাংলাদেশ তঞ্চঙ্গ্যা কল্যাণ সংস্থা" এর উদ্যোগে এক অভূতপূর্ব তঞ্চঙ্গ্যা মহাসম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। প্রায় পাঁচ হাজারের অধিক তঞ্চঙ্গ্যার উপস্থিতিতে এই সম্মেলন উপলক্ষে মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে নিম্নোক্ত গানটি উদ্বোধনী সংগীত হিসেবে পরিবেশিত হয়েছিলো।

রাইংখ্যং গাং, কাপ্তেই গাং, মাতামুরী আগা শংঘ থুম
ধুপশিল, আলিকদম, ওয়াগ্গা, রোয়াং ছড়ি
ঘিলামোঈন আ ঝাম্‌দি মোঈন
আমার আঘে আমার থেব॥
কুড়ু গেলাক পংচান দুমপ্রু
কানা গিংখুলী নাই রাজ সভাত
বীর, কিত্তং, শুচিঅং
নাই ই জাগাত্ রুচিঅং
বংশী গিংখুলী কালামন॥

লালমুনি খাইত্‌বুলি লক্ষীধন
আমা কবালত্ নাই কুঞ্জ মাজন,
তিরাশী, নংফ, শরৎ বৈদ্য নাই
নাই রাজকবি শ্রীপমলাধন॥

দৈনাক তঞ্চঙ্গ্যার বার তালুক-
মিলি মিশি থেবার ই দিনত্
ফাপ্রু শ্রীধন আমু কোই গিয়ন
উড়িব বেল্লোয়া পূব কুনত্॥

মহা পণ্ডিত অগ্রবংশ
দি গেল ধর্মকাম জ্ঞানত্তুন্
আন্ধার ছাড়ি পহ্‌অরত্ আইস
ব্যাক্ তঞ্চঙ্গ্যা ঝাড়ত্তুন॥

গানটি রচনায়- রতিকান্ত তঞ্চঙ্গ্যা, সুর দিয়েছেন- মনোজ বাহাদুর আর সমবেত কণ্ঠে গেয়েছেন মীনা তঞ্চঙ্গ্যা, সিন্ধু তঞ্চঙ্গ্যা, বিভা তঞ্চঙ্গ্যা, মন্দা তঞ্চঙ্গ্যা, শ্রাবণী তঞ্চঙ্গ্যা, সুফলা তঞ্চঙ্গ্যা, নির্বিজয় তঞ্চঙ্গ্যা, প্রিয়দর্শী তঞ্চঙ্গ্যা, রেণুকুমার তঞ্চঙ্গ্যা এবং আরও অনেকে। যন্ত্র সংগীতে- মনোজ বাহাদুর, বিপ্লব বড়ুয়া, প্রদীপ বাহাদুর।

তঞ্চঙ্গ্যাদের বাচ্যানী (জাগরনী গীত)

(১)

ও ও মুয়াল্যা লক্
ও ও জুম্মোয়ালক্
বেলান্ হ্আলেই যার ঝাড়ী উর
খরক্ যেবা ঘুম
সময় থাক্কে পথ ধর
ঔই গেলং ব্যাক্ থুম॥
দিন দিন বাত্তন্ মানুইত্
অভাব এল চাবি
ঝাড়ত্ মুড়াত্ যুগ যার
আন্ধারত্ আঘি ডুবি
চুগ্ থাগরে আমি অন্ধ
মদে ভাঙে জীবন
লেগাপড়া ন শিগিনায়্
সারুবা দিক্যা মন॥
জ্ঞানী লক্লৈই মিশি থাগ
শিগিত্ত হ্অ ব্যাক্কুন
আন্ধার ছাড়ি পহ্অরত্ আইস
লামি আইস মুআত্তুন্॥

(২)

ও ও বাপ ভাই লক্
ও ও মা বোইন্ লক্
মানেই জনম মআ জনম
জানি লুবা গুনীত্তুন্
মিছা ভুত দেবেরা মানি
মুক্তি নাই দুগত্তুন্॥
অসা বৈদ্যর চৌদ্দ তাল
শিক্ষা দেরন্ জনম্ ভর্
ছাগল শুগ কুআ কাবি
মুলে যেবং নরগর্॥
ঝাড়া পড়া দালি পূজা
আমারে গুল্য ছাড়া
কর্মফল পাচ্চেবং আমি
জ্ঞানী লগর্ কড়া॥
জুর্মিলে দুক্, মত্তে দুক্
উবাই নাই পাবত্তুন্
লেগা পড়ায় শিগিত্ত হ্অ
দুরত্ থাগ মদত্তুন্॥

(৩)

দুক্ কাম গর আ
লেগা পড়া শিগ
মানস্যার সুক্-দুক্ দেগর্নী
বহু বহু বাত্তন্ মানুইত
বাচিবং কেনে ভাবর্নী॥
ভাত রাদ্ আইছের্ ন পাইবং বাচি
দেশর্ খবর রাগনী
চোল ন মিলিব, টেঙা ন মিলিব
কাম ন মিলিব জাননি॥
তুমি সাবধান হ্অ
পআ ন বাড়ানা গ চিন্দানী
আল্সিয়া ন ওই দুক্-কাম্ গুইবং
বাচিবার চিন্দা রাগ মনানী॥

(৪)

আচ্যা নয় কাল্যা
কাল্যা নয় পুশু
মআ পুইব একদিন
ন থেব সংসারত্ কিছু
হআক্কন্যা জুর্মিলং ই সংসারত॥
মা বাপ মুক পআ
ভাই বোইন্ মুড়ুম্
যমে আই নিব টানি
মাপ নাই ইত্তুন্
সংসারর্ মায়া ছাড় অন্দরত॥
ঘ জাগা সম্মান
ধন জন টেঙা পুইসা
ন নিবং লগে ইয়ুন
আমনত্ কনা মিছা
লোভত্ পুই, আঘি অজ্ঞানত্॥
মরণ এব আরেক্যা
সুনাম দুন্নাম থেই যেব
নিবং লগে পাপ পূণ্য
জীবন বাত্তি থুম উব
ছাই ঔই যেবং গাং কুলত্॥

তঞ্চঙ্গ্যা জাতির ইতিহাস, ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি বিষয়ক আরও অধিক বই পেতে আমাদের মেইল করুন ঃ chandrasen2014@gmail.com এই ঠিকানায়।

[illegible]

[illegible]

[illegible] ; [illegible] [illegible] [illegible]